JE SOB MUSLIM MONISHI BADLAY DEASEN PRITHIVI

| M U N I R   T O U S I F |

www.banglainternet.com represents

List :

Jabir ibn Hayyan
Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi
Al-Battani.
Nasir al-Din al-Tusi
Ibn Rushd
Al farghani
Ibn Khaldun
Al Beruni
Al-Ghazali
Ibn Al-Nafis
Ibn Bakr
Abul Wafa
Omar Khayyám
Al-Haitham
Ibn Sina

a n d m o r e . . . .

জাবির ইবনে হাইয়ান
আধুনিক রসায়নের জনক

ধাতু ও ইস্পাত। আমরা নানা কাজে এর ব্যবহার করি। এই ধাতু ও ইস্পাতের ওপর সভ্যতা নির্ভরশীল। চামড়া ও কাঁচের ওপরও তেমনি সভ্যতা নির্ভর করে। সভ্যতাকে বর্ণময় করে তোলার জন্যে চারদিকে নানা বর্ণের সমাহার। ইতিহাসের নানা অধ্যায় রচিত হয়েছে সোনালি বর্ণে। সোনালি বর্ণমালায়। এই যে ধাতু, ইস্পাত, চামড়া ও গ্লাসের কথা বলা হলো, এসব উপাদান প্রথম উদ্ভাবন করেন একজন মুসলমান। সোনালি অক্ষর প্রথম উদ্ভাবন করেন তিনি। তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নাম। তাকে গণ্য করা হয় 'আধুনিক রসায়নের জনক' বলে। তার পুরো নাম আবু মূসা জাবির ইবনে হাইয়ান। আল-হাররানি নামেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর আরেক জনপ্রিয় নাম আল-সুফী।

তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা নেই। তবে ৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তিনি কাজ করেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে। তখন তিনি একজন রাসায়নবিদও ছিলেন। কর্মস্থল ছিল কুফা। তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন ইমাম জাফর সাদিক এবং খালিদ ইবনে ইয়াজিদ-এর কাছে। খালিদ ছিলেন একজন উমাইয়া রাজপুত্র। তিনি খালিফা হারুন অর রশিদের বারমাকি উজিরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। জাবির ইবনে হাইয়ান জীবনের শুরু থেকে বিজয়ীর বেশে জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখেন। তার বাবা ছিলেন একজন গরিব ওষুধ বিক্রেতা।

জাবির ইবনে হাইয়ানের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল বস্তুর বৈচিত্র্য আনয়ন। তিনিই বিজ্ঞানী হিসেবে প্রথম পদার্থের বৈচিত্র্য নির্ধারণ করেন। তিনি পদার্থের জগৎকে তিন ভাগে ভাগ করেন। প্রথম ভাগ হচ্ছে স্পিরিট। দ্বিতীয় ভাগে ধাতু। এবং তৃতীয় ভাগ কম্পাউন্ড বা যৌগিক পদার্থ। তাঁর এই মৌলিক আবিষ্কারের সূত্রেই পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানীরা পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ করেন। এগুলো হচ্ছে : ধাতু, অধাতু ও উদ্বায়ী বস্তু। জাবির ইবনে হাইয়ান তাঁর নিজের গবেষণাগারে স্পিরিট আবিষ্কার করেন। তিনি সুনির্দিষ্ট কিছু পদার্থ উদ্ভাবন করেন। এগুলো তাপ দিলে উড়ে যায়। এর মধ্যে ছিল কর্পুর, আর্সেনিক ও এমোনিয়াম ক্লোরাইড। তিনি একটি কঠিন পদার্থের ভেতরে এগুলো আবিষ্কার করেন। এই কঠিন পদার্থকে স্বর্ণ, সিলভার, জিঙ্ক, তামা, লোহা ইত্যাদি শ্রেণীতে ফেলেন। তিনি আমাদের এমন কিছু যৌগিক পদার্থ উপহার দেন, যেগুলোকে ভেঙে চুরমার করে পাউডার করে দেয়া যায়। জাবির ইবনে হাইয়ানের এসব আবিষ্কার সে সময়ের বোদ্ধা লোকজনদের অবাক করে দেয়। এই মহান বিজ্ঞানী বারো'শ বছর আগে পরীক্ষণের এক অনন্য পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই একই পদ্ধতিই পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় আধুনিক রসায়নে। জাবির ইবনে হাইয়ান অযথাযথ রসায়নকে সত্যিকারের রসায়নে রূপান্তর করেন।

জাবির উদ্ভাবন করেন স্ফটিকীকরণ, ভস্মীকরণ, উদ্বায়ীকরণ, পরিশোধন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার। জাবিরের মতো মুসলিম বিজ্ঞানীরাই রসায়নকে বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। রসায়ন-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Chemistry। এই Chemistry শব্দটি নেয়া হয়েছে আরবী শব্দ 'আল-কেমিয়া' থেকে। জাবিরের ছিল একটি চমৎকার গবেষণাগার। সেটি হারিয়ে গেছে সময়ের নিষ্ঠুর কবলে। তবে সময়ের প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁর অবদান হারিয়ে যায়নি। সময় আমাদের ভুলিয়ে দিতে পারেনি : তিনি আবিষ্কার করেছিলেন লোহা থেকে ইস্পাত তৈরির পদ্ধতি। তিনি কাপড়ে রং করার বিষয়টির সূচনা ঘটান। চামড়া পাকা করার পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেন। ওয়াটার প্রুফ ব্যবস্থার আবিষ্কারও করেন তিনি। লেমিনেশনের মাধ্যমে কাপড়ের একদিক পানি রোধ বা ওয়াটার প্রুফ করার ব্যবস্থা তাঁরই আবিষ্কার। গ্লাস উৎপাদনে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের

ব্যবহারের সূচনা করেন তিনি। তিনি আমাদের প্রথম জানান, কী করে লোহার মরচে ধরা রোধ করতে হয়। রং ও গ্রীজ আবিষ্কারও করেন তিনি। এসব প্রধান প্রধান পরীক্ষার সময় তিনি আবিষ্কার করেন আরেক বিস্ময়। সে বিস্ময়ের নাম : Aqua-rigia। এটি পানির একটি দ্রবণ। এতে স্বর্ণ দ্রবীভূত হয়। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি নাইট্রিক, সাইট্রিক, হাইড্রো ক্লোরিক ও টারটারিক এসিড দ্রবীভূত করেন।

বাস্তবে জাবির Law of Constant Proportion বা ধ্রুব অনুপাতের নিয়ম বাতলে দেন। তিনি রাসয়নিক পদার্থ আবিষ্কারের চেয়ে রাসায়নিক পদ্ধতি-প্রক্রিয়া আবিষ্কারে ছিলেন বেশি মনোযোগী। তার লক্ষ্য ছিল রাসায়নিক বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এবং তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন বিক্রিয়ার কারণ। তার অধ্যবসায় ও সাধনা সূত্রেই তিনি Law of Constant Proportion আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

লেখক হিসেবে জাবির ছিলেন খুবই উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অসংখ্য। তিনি নিজে লিখে গেছেন একশ'রও বেশি বই ও টেস্টামেন্ট বা বিধি বিধান। তাঁর 'কিতাব-আল কেমিয়া' এবং 'কিতাব আল সাবিন' দু'টি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই। এই বই ভাষান্তরিত হয়েছে লাতিন ও ইউরোপীয় বেশ ক'টি ভাষায়। এসব দেশে বইটি প্রচুর সমাদৃত হয়। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যগুণে রসায়ন শাস্ত্রে সূত্রায়ন করে গেছেন নতুন থেকে নতুনতর শব্দাবলী। এর একটির উদাহরণ টানাই যথেষ্ট। শব্দটি হচ্ছে Alkato। এ ধরনের শব্দ বৈজ্ঞানিক নামকরণ বিদ্যায় খুবই সুপরিচিত। অনেক শব্দই এখনও আরবী ভাষায় বিদ্যমান। এসব শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ হলে, সেগুলোতে একজন সত্যিকার বিজ্ঞানীর জীবনেরই প্রতিফলন ঘটতো। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বরাবর চেষ্টা করে গেছেন তাদের পূর্বসূরীদের যথাযথ স্বীকৃত দেয়ার জন্যে। বারমাকি উজিরের পতনের পর জাবির দুর্যোগে পড়েন। রাজকীয় রোষ তাঁর ওপর নেমে আসে। তাঁকে তাঁর কুফার বাড়িতে অন্তরীণ রাখা হয়। আধুনিক রসায়নের জনকপ্রতিম ও সর্বকালের সেরা এ বিজ্ঞানী একজন বন্দী হিসেবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আল-কাওয়ারিজমী

বীজগণিতের জনক ব্যক্তিত্ব

আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ। পুরো নাম আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল-কাওয়ারিজমী। ছিলেন জগত-বিখ্যাত এক গণিতবিদ। গণিত জগতের এক অভিজাত জন। তাঁর সময়ে গণিতের জ্ঞানকে তিনি এক অভাবনীয় সমৃদ্ধতর পর্যায়ে নিয়ে তুলেন। একজন গণিতবিদ হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদও। ভূগোল বিষয়ে তার প্রজ্ঞা উৎকর্ষতাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন এলজাবরার জনক। তিনি প্রথম তাঁর একটি বইয়ে এই এলজাবরার নামোল্লেখ করেন। সেই বইটির নাম : 'আল-জাবর ওয়া-আল-মুদাবিলা'। তিনিই সৃষ্টি করেন গণিতের এই নতুন শাখা। তাঁর হাতেই গণিতের এই শাখাটি পরবর্তী সময়ে আরও সমৃদ্ধতর হয়। এলজাবরায় লিনিয়ার বা একঘাত এবং কোয়াড্রেটিক বা দ্বিঘাত সমীকরণ আছে। স্কুল এলজাবরায় আমরা

কোন সমীকরণ সমাধান করে যখন x অথবা y-এর একটি করে মান পাই, সেগুলোই লিনিয়ার বা একঘাত সমীকরণ বলি। 2x–2=0 একটি এক ঘাত সমীকরণ। এখানে x-এর একটি মাত্র মান আছে এবং x=1

আবার কলেজ এলজাবরায় আমরা দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করি। সেখানে x অথবা y-এর মান দু'টি করে পাওয়া যায়। যেমন x^2-5x+6=0 এটি একটি দ্বিঘাত সমীকরণ। এখানে x-এর মান হচ্ছে ২ অথবা ৩। যাই হোক এই একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণের বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা প্রথম তুলে ধরেন আল-কাওয়ারিজমী।

তাঁর এলজাবরা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে গণিত জগতে এর উপযোগিতা অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যায়। মধ্যযুগের আর কোন গণিতবিদই গণিত জগতে তাঁর সমান্তরাল কর্ম উপস্থাপন করে যেতে পারেননি। তাঁর অনুশীলন ছিল মৌলিক। তার অনুশীলন-কর্মগুলো সাথে সাথেই নতুন আবিষ্কার বলে স্বীকৃতি পায়। তাঁর গণিত বিষয়ক অসাধারণ প্রজ্ঞা অন্যেরা গ্রহণ করেছে কৃতজ্ঞতার সাথে। গ্রীক ও হিন্দু গণিতবিদদের মধ্যে গণিতের যে অসম্পূর্ণতা ছিল, সে অসম্পূর্ণতা পূরণ করেছিলেন আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ। যেনো অনেকটা ঐশ্বরিকভাবে, তাঁর গণিতের বিষয়-আশয় উপস্থাপনা ছিল অসাধারণ ও অনন্য।

আরবরা আবিষ্কার করেন শুন্য (০) সংখ্যা বা অঙ্কটি। এটা ছিল এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। কিন্তু আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এই 'শূন্য' ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ করেন। তার 'শূন্য' ব্যবহারের নীতি-ব্যাখ্যা 'শূন্য' ব্যবহারকেই দ্রুততর করে তোলে। এর ফলে গণিত এসে দাঁড়ালো তার পরিপূর্ণ প্রেক্ষিতে। এখানেই তিনি থামলেন না। তাঁর মগজে ঝড় বয়ে গেলো। তিনি দশমিক ব্যবস্থাকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিতে চাইলেন। এক্ষেত্রে তার অবদান প্রশংসনীয়। পরিসংখ্যান ব্যবস্থা 'এলগোরিদম' অথবা 'এলগোরিজম' নাম দেয়া হলো তাঁর নামানুসারে। ভারতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার সময় আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ গণিতের আরেকটি শাখার আবিষ্কার করেন। তিনি আবিষ্কার করেন ভগ্নাংশের বিস্ময়কর দিক। তাঁর সময়ের গণিতবিদেরা তাঁর অসাধারণ মেধার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাজগুলো 'আরব্য-কর্ম' নামে পরিচিত। শিগগিরই তাঁর কর্ম-অবদান পৌঁছে গেলো ইউরোপে। ইউরোপীয়রা দ্রুত তাঁর বই ও লেখাগুলো অনুবাদ করে নেয়। সেই সাথে আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইউরোপেও বিখ্যাত হয়ে যান।

এই মুসলমান পণ্ডিতবরের কাছে ত্রিকোণোমিতি অনেকটা ঋণী। ত্রিকোণোমিতি হচ্ছে গণিতের আরেকটি শাখা। সমকোণী ত্রিভুজের তিন কোণ আর বাহু নিয়ে ত্রিকোণোমিতির কারবার। আমাদের স্কুল ও কলেজের পাঠ্যসূচিতে এই বিষয়টি পড়ানো হয়। আল-কাওয়ারিজমী উদ্ভাবন করেন ত্রিকোণোমিতির বিস্তারিত উপাত্ত। তিনিই 'কনিক সেকশন'-এর গাণিতিক ধরনের আধুনিকায়ন

করেন। এর পর তিনি হাত বাড়িয়ে দেন ক্যালকুলাসে। তিনি ক্যালকুলাসের উন্নয়ন ঘটিয়ে এর আধুনিকায়ন করেন। ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে ক্যালকুলাসের একটি অধ্যায়। ক্যালকুলাস নিয়ে কাজ করার সময় তিনি ডিফারেন্সিয়েশনের অবাক জগতে প্রবেশ করেন। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য এবং ব্যাপক। তিনি এ বিষয়ে একটি বই লিখে গেছেন। তিনি ভূগোলকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গেছেন নতুন ধারণা ও প্রজ্ঞার জগতে। তিনি টলেমি সূচিত অনেক ভৌগোলিক ধারণার সংশোধন করেন। ইউরোপীয়রা এতে বিস্মিত হয়। কে এই দুঃসাহসী মুসলমান, যে টলেমির তত্ত্বাবলী পর্যন্ত সংশোধন করার মতো সাহস দেখাতে পারেন? সবখানে এই প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়লো; কিন্তু আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদের নতুন নতুন আবিষ্কার ছিল অলঙ্ঘনীয়। টলেমিয় মানচিত্র পর্যন্ত তিনি সংশোধন করেন। তাঁর আরও কাজের মধ্যে ঘড়ি ও সূর্যঘড়ির ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অন্তর্ভুক্ত।

দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর অনেক বই-ই লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। কিন্তু মানব জাতি তাঁর গণিত বিষয়ক আরবী বইগুলো থেকে বঞ্চিত থাকে। 'কিতাব আল-জামা ওয়াল তাফরিক-বিল-হিসাব-আল হিন্দ' হচ্ছে তেমনি এক বই। লাতিন ভাষায় এই বইটি এখনও অস্তিত্বশীল আছে। তাঁর বীজগণিত সম্পর্কিত বই 'আল-মাকালা ফি হিসাব-আল-জাবর-ওয়া-আল-মুকাবিলা' লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় দ্বাদশ শতকে। অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে এই নতুন বিজ্ঞান পশ্চিমা জগতে প্রবেশের সুযোগ পায়। এর আগে ইউরোপে বীজগণিত ছিল একটি অচেনা বিষয়। ইউরোপীয়রা এ বিষয়ে ছিল পুরোপুরি অজ্ঞ।

আবু আবদুল্লাহ'র জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক উপাত্ত অনুবাদ করা হয় ইউরোপীয় ভাষায়। পরবর্তী সময়ে এগুলো চীনা ভাষায়ও অনুবাদ হয়। তাঁর ভূগোল বিষয়ক বই 'কিতাব সুরাত-আল-আর্দ'-ও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনুবাদ কর্মের মধ্যে মানচিত্রগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহুদী পঞ্জিকা সম্পর্কেও তিনি বই লিখে গেছেন। সে বইয়ের নাম : 'ইসতিখেরাজ তারিখ আল-ইয়াহুদ'। মানব জাতি তাঁর দু'টি মূল্যবান বই থেকে বঞ্চিত। সেগুলো হচ্ছে তাঁর সাধারণ দিনলিপি 'কিতাব আল-তারিখ' এবং সূর্য ঘড়ির ওপর লিখিত বই 'কিতাব আল-রুখমাত'।

ষোড়শ শতক পর্যন্ত তাঁর অনেক বই ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। জ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহই তাকে একজন পুরোপুরি বিজ্ঞানীতে পরিণত করে তুলেছিল। তাঁর গবেষণা বিজ্ঞানীদের সমসাময়িক অনেক বাধা দূর করে। আজও তাঁর অবদান সমুজ্জ্বল। তিনি ৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মারা যান।

আল-বাত্তানী
যিনি ভুল প্রমাণ করেন টলেমির দেয়া তত্ত্ব

একজন মুসলিমের ধ্রুপদ অবদানসূত্রে নবম শতাব্দী স্বতন্ত্র হয়ে ধরা পড়ে। নবম শতাব্দীকে স্মরণে আনলেই এই মুসলিম মনীষী আমাদের স্মরণে এসে আঘাত হানেন। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী-দার্শনিক-দরবেশ। সায়েন্টিস্ট-ফিলোসফার-সেইন্ট। নাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনে জাবির ইবনে সানান আল-বাত্তানী আল-হারানী। তিনি মানব জাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন সৌর বছরের সঠিক পরিমাপ। তিনি হিসেব করে দেখান ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে এক সৌর বছর। এ সম্পর্কিত হালনাগাদ হিসাব এই পরিমাপের কাছাকাছি। সে কারণে সত্যিকার অর্থে সৌর বছরের আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য হচ্ছেন আল-বাত্তানী।

পণ্ডিতবর আল-বাত্তানী একজন দরবেশতুল্য মানুষ ছিলেন। হারান রাজ্যে তাঁর জন্ম। জন্মেছেন ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। কারও কারও মতে, হারান রাজ্যের বাত্তান নামের এক স্থান তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন একজন বিশিষ্টজন। বাত্তানী তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নেন তাঁর বাবার কাছে। তাঁর বাবার নাম ছিল জাবির ইবনে সানান আল-বাত্তানী। তিনিও তার সময়ের একজন বড় বিজ্ঞানী ছিলেন। আবু আব্দুল্লাহ রাক্কাতে যান মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে রাক্কা ছিল জ্ঞানার্থীদের জন্যে এক তীর্থস্থান। জ্ঞানান্বেষণে সাগ্রহীরা রাক্কায় যেতেন। এটা ছিল পণ্ডিতদের এক নগরী। জ্ঞানী-গুণী আর প্রাজ্ঞ জনেরা সেখানে বসবাস করতেন। আব্দুল্লাহ নিজের জন্যে সেখানে একটা স্থান করে নিতে সক্ষম হন। তিনি সেখানে একজন সর্বজনগ্রাহ্য পণ্ডিতরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নবম শতাব্দীর শুরুতে তিনি চলে যান সামারাহ্‌তে। সেখানে তিনি বাকি জীবন বসবাস করেন। তিনি বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ জ্যোতির্বিদ। তখন তাঁর সমতুল্য জ্যোতির্বিদ কেউ ছিলেন না। সেই সাথে তিনি ছিলেন বড় মাপের গণিতবিদ। তিনি একটানা ৪২ বছর এক্ষেত্রে নানা গবেষণা চালিয়ে যান। তিনি গবেষণা চালান গণিত আর জ্যোতির্বিদ্যার নানা শাখায়। এসব গবেষণার মাধ্যমে তিনি মানব জাতির সামনে অসাধারণ সত্য উদ্‌ঘাটন করে গেছেন। তিনি টলেমীর অনেক তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করেন। সূর্য ও পৃথিবীর সর্বোচ্চ অবস্থান সম্পর্কিত টলেমীর একটি তত্ত্ব ভুল প্রমাণ করে আমাদের কাছে তিনি প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করেন। সঠিকভাবে পরিমাপ করে দেখান, এটা হচ্ছে ১৬ দশমিক ৬৭ ডিগ্রি।

এ আবিষ্কার সূর্যের গতি ও সময়ের সমীকরণে সামান্য পরিবর্তন আনে। কপারনিকাস সূর্যের ইকুইটরিয়েল গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু আল-বাত্তানী তা কখনও বিশ্বাস করতেন না। আল-বাত্তানী গ্রহণের সময়ের সূর্যের ও চাঁদের সঠিক পরিমাপ নির্ণয় করেন। তিনি ঋতুর সময়-পরিধিও নির্ণয় করেন। সঠিকভাবে সূর্যের কক্ষপথে পরিভ্রমণ পরিস্থিতি তুলে ধরতে সক্ষম হন। তিনি এর সবচে' কম গড়ও নির্ধারণ করেন।

আল-বাত্তানী সম্পূর্ণভাবে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কিত টলেমীর ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, সূর্যের কৌণিক অবস্থান পরিবর্তনীয়। তিনি বার্ষিক সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য আমাদের জানান। আসলে তিনি তৎসময়ের চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ সম্পর্কিত সকল বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে পরিবর্তন আনেন। বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন প্রকৃত সত্য। সত্য ধারণার প্রতিফলন ঘটান। তিনি ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নতুন চাঁদ দেখার সঠিক পদ্ধতির সূচনা করেন। জ্যোতিষী

দানত্রোনে সফলতার সাথে আল-বাত্তানী পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে গেছেন। গ্লোবোলার ত্রিকোণোমিতির নানা সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছেন আল-বাত্তানী।

গণিতের বিষয়েও তিনি ছিলেন একজন অগ্রদূত। তিনি গ্রীকদের সিক্সোনি সিস্টেমের বিনাশ সাধন করেন। এর পরিবর্তে সূচনা করেন বিশুদ্ধ বানান বিদ্যা বা অর্থোগ্রাফি। তাঁর এ পদ্ধতি আরও উন্নততর বলে প্রমাণিত হয়।

আব্দুল্লাহ আল-বাত্তানী জ্যোতির্বিদ্যা ও ত্রিকোণোমিতি বিষয়ে অনেক বই লিখে গেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বই হচ্ছে : Geej। এটি লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। রোমের ভ্যাটিকানে এর মূল কপি পাওয়া যায়। রেনেসাঁ-পূর্ব ইউরোপকে তাঁর আবিষ্কার ও ধারণা ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিল। তাঁর বইগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। জ্যোতির্বির্দ্যা ও ত্রিকোণোমিতি সম্পর্কিত তাঁর আবিষ্কার-উদ্ভাবন ছিল শিক্ষণীয়। বিজ্ঞানের এই দু'টি শাখার উন্নয়নে তাঁর অবদান আমাদের জন্যে প্রেরণার উৎস।
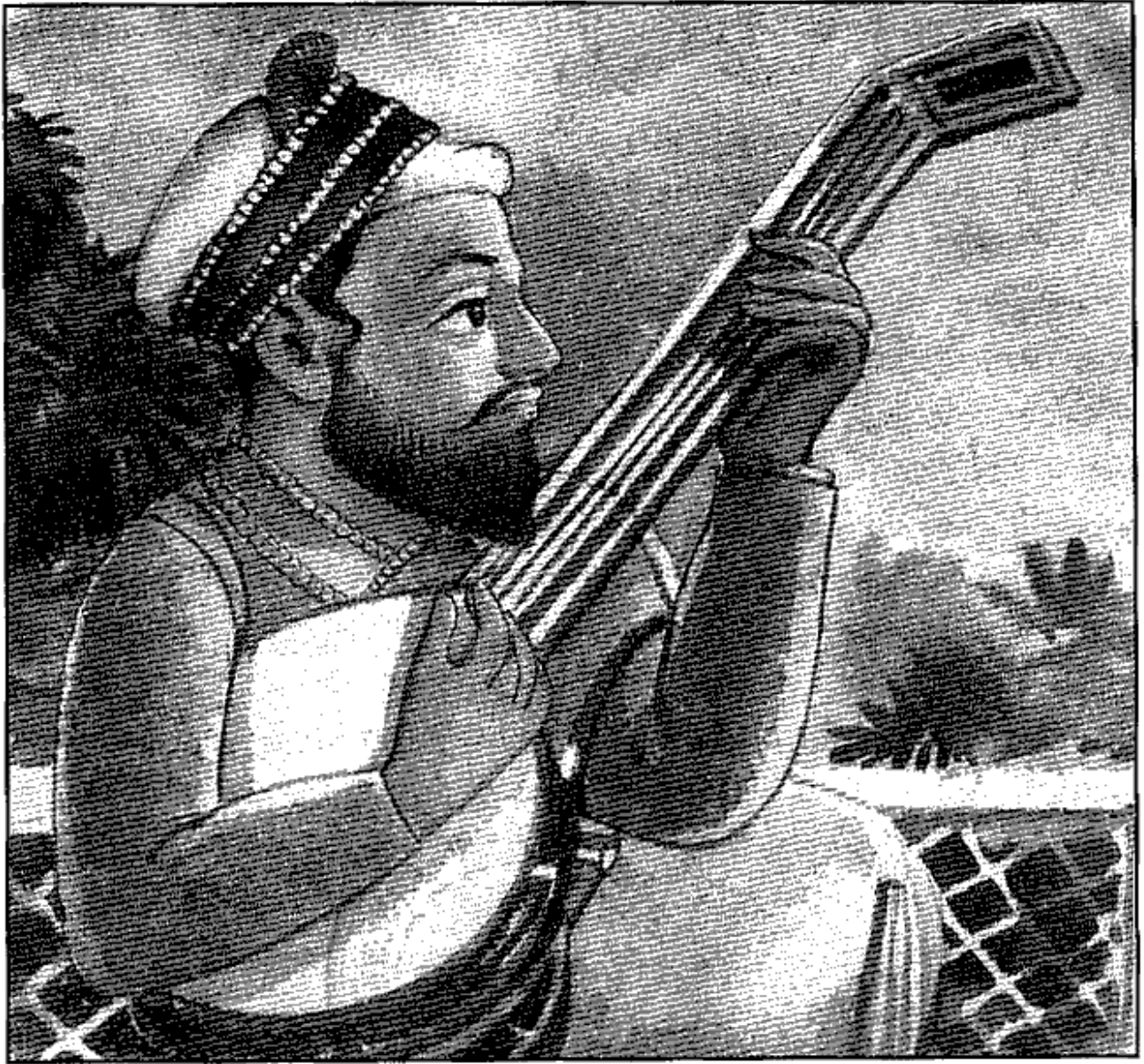
আমীর খসরু
ভারতীয় সঙ্গীতের ফাদার-ফিগার

হযরত আমীর খসরু ছিলেন একজন সূফী। একজন দরবেশ। সেই সাথে একজন জ্যোতির্বিদ। একজন সুখ্যাত কবি এবং একজন অনুপম সঙ্গীতজ্ঞ। এসব নানা গুণে গুণান্বিত হযরত আমীর খসরু নিজেকে করে তোলেন এক কিংবদন্তি। দিল্লির হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া ছিলেন তাঁর শিক্ষক। আর তিনি ছিলেন তাঁর যথাযোগ্য ছাত্র। হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া তাঁকে প্রজ্ঞাতাড়িত বাগান পথে পরিচালিত করেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যেকার সমীকরণ ছিল স্বর্গীয় পবিত্রতায় পবিত্র। হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া প্রায়ই বলতেন, শরীয়ত বা ইসলামী আইন যদি অনুমোদন দিতো, তবে তিনি আমীর খসরুকে বলতেন তাঁর নিজের কবরেই তাকে কবর দিতে। এটা ছিল আমীর খসরুর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও পবিত্র সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। আর ভালবাসা হচ্ছে ধর্ম হিসেবে ইসলামের

সুগন্ধী। সে সময়টা ছিল বিশতম শতাব্দীর শুরুর দিকে। তখন এই উপমহাদেশ ছিল বেশ কিছুসংখ্যক মুসলিম দরবেশের লালনক্ষেত্র। পৃথিবীর সব অংশে তখন ইসলামের আলো জ্বলজ্বল করছে। সে সময়ে ইসলামের আকাশে এক উজ্জ্বল তারকা হিসেবে আমীর খসরুর আবির্ভাব। তার বাবার নাম আমীর সাইফ উদ্দিন খান। তিনি দিল্লির সুলতানের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ছেলে আমীর খসরুকে একজন বড় দরবেশের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করার প্রার্থনা জানান। সেই দরবেশ ছিলেন মাহবুব-এ-এলাহী হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া। তিনি পরিচালিত হলেন পবিত্র ইচ্ছায়। পরিপূর্ণতা লাভের অনেক আগেই আমীর খসরুকে তিনি মুরিদ হিসেবে গ্রহণ করেন।

তখন মোহাম্মদ তুঘলকের শাসন সময়। হযরত আমীর খসরু তাঁর রাজ দরবারের এক উল্লেখযোগ্য সদস্য। সেখানে ছিল তাঁর সব ধরনের সুখ্যাতি, নাম, যশ। এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষকের প্রতি আরও বেশি করে আত্মনিবেদিত হতে পেরেছিলেন। তিনি নিজের প্রজ্ঞা ও সাধনা বলে পৌঁছুতে ও বিচরণ করতে পেরেছিলেন রূহানী জগতে। তিনি নিজের আত্মাকে করতে পেরেছিলেন পরিশুদ্ধ। পরিশুদ্ধতার শীর্ষে পৌঁছে তিনি হয়ে ওঠলেন হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার প্রধানতম মুরিদ-শিষ্য-ছাত্র। প্রজ্ঞা এসে ভর করে তাঁর ওপর। হয়ে উঠলেন যথাযোগ্য দার্শনিক।

তাঁর কবিতাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে ফার্সী ভাষায়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক লেখক। তাঁর ব্যঙ্গ-কৌতুক রচনা ছিল গভীর চিন্তাসমৃদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ তাগিদময়। এগুলো পবিত্র প্রজ্ঞায় ছিল সুসমৃদ্ধ। পরিপূর্ণ ছিল মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসায়। তাঁর কবিতায় ফুটে উঠতো আল্লাহর প্রতি সীমাহীন ভালবাসার বাণী। তিনি চেষ্টা করতেন সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের মধ্যেকার ধ্রুপদ সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করতে।

হযরত আমীর খসরুকে বলা হয়, ভারতীয় সঙ্গীতের ফাদার-ফিগার। সঙ্গীত জগতে বেশ কিছু অবদানের জন্যে গোটা উপমহাদেশ হযরত আমীর খসরুর কাছে চির ঋণী। তিনি ভারতীয় বেশ কিছুসংখ্যক বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবক। কিন্তু তাঁর এই অবদানের কথা অনেক ঐতিহাসিক এড়িয়ে গেছেন। খেয়ালের সূত্রপাত আমীর খসরুরই অবদান। অনেকের বিশ্বাস, তিনি সঙ্গীত জগতে আরও বেশ কিছু মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। এ ব্যাপারে গভীর গবেষণা প্রয়োজন। কোনো কোনও ঐতিহাসিক বলেন, তিনি তাঁর বাদ্যযন্ত্রকে ব্যবহার করেছেন এবাদতের কাজে। যা কারও কারও মতে, গ্রহণযোগ্য নয়। নূর-এ-এলাহীর কাছে পৌঁছার বাহন হিসেবে তিনি কাজে লাগিয়েছেন বাদ্যযন্ত্রকে। তিনি তাঁর ওস্তাদ ও হযরত

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ ভালবাসা প্রকাশ করে গেছেন তাঁর বাদ্যযন্ত্রের মধ্য দিয়ে। কবিতা ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। তিনি বিভিন্ন ধরনের জিকিরের মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদন করতেন। এসব জিকির এক সময় সৃষ্টি করতো এক ধরনের সঙ্গীতের মূর্ছনা। আর তা থেকে জন্ম নিতো নানা ধরনের সঙ্গীত আর সুর। তাঁর দরবেশতত্ত্ব সেই সুর আর সঙ্গীতকে করে তুলতো প্রাণবন্ত ও জীবন্ত। তাঁর সময়ে এবং পরবর্তী পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত তা ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে আরও দুই সাধক তার ধ্যান-ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন। তাদের একজন ছিলেন সুলতান মুহাম্মদ সারকী। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে খেয়ালের আরও উন্নতি সাধন করেন। আঠারো শতকে এসে খেয়ালকে সত্যিকারের ধ্রুপদ সঙ্গীতে রূপায়িত করা হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সাদারঙ্গা নিয়ামত খান। যদ্দিন ইনস্ট্রুমেন্টাল ধ্রুপদ বা ক্লাসিক্যাল মিউজিক বেঁচে থাকবে, তদ্দিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হবে এ ক্ষেত্রে আমীর খসরুর অবদান।

একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে আমীর খসরুর অবদান ভুলে যাওয়ার পথে। দিল্লির রাজনৈতিক পালাবদল অনেক রক্তগঙ্গা বইয়েছে। এতে বহু প্রাণ গেছে। সেই সাথে হারিয়ে গেছে অনেক বৈজ্ঞানিক অবদান আর অবদায়ক। অনেকে বলে থাকেন, আমীর খসরু মুসলিম প্রজ্ঞাবানদের সম্মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন দিল্লিকে কেন্দ্র করে। ফার্সী ছিল জ্ঞান প্রচারের এক অন্যতম বাহন। এর ফলে এই দরবেশ-জ্যোতির্বিদের পক্ষে বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানার্জন সহজতর হয়ে ওঠেছিল। তিনি এক্ষেত্রে যা অর্জন করেছিলেন, তা ছিল তাঁর গবেষণার ফসল। এসব ইতিহাস সুনির্দিষ্টভাবে বিধৃত রয়েছে ফার্সী ভাষায়। ফরাসী ইতিহাসবিদেরা তা ফার্সী ভাষায় লিখে গেছেন। সময়ে দাবি হচ্ছে, গবেষকরা এগিয়ে আসবেন, গবেষণার মাধ্যমে তাঁর অবদানের কথা উন্মোচন করবেন।

এই মহান সূফী-সাধকের মৃত্যুর সঠিক সময়-তারিখ জানা নেই। তবে হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মৃত্যুর দুই মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেন। সম্ভবত ৭২৫ খৃষ্টাব্দের ১১ অথবা ১৮ রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন।

আল-তুশি
জিজ-ইলখানি উপাত্তের উদ্ভাবক

১২৫৮ খৃস্টাব্দে বাগদাদ নগরীতে এক মহা লুণ্ঠনযজ্ঞ চলে। তার নেতৃত্ব দেন হালাকু খান। মূলত এই লুণ্ঠনযজ্ঞের মাধ্যমে বাগদাদ নগরীকে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম নগরী হিসেবে তখন সুপরিচিত ছিল এই বাগদাদ নগরী। হালাকু খান বাগদাদ নগরীতে ঢুকে সেই জ্ঞান বিজ্ঞানের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান দুমড়ে-মুচড়ে দেন। বিপুল সংখ্যক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই সে সময় বিনষ্ট হয় বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কিন্তু তার পরেও এই হালাকু খান ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রজ্ঞার একজন পৃষ্ঠপোষক। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় একজন বিজ্ঞানীর উন্মেষ ও বিকাশ হয়েছিল। এই বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক আবিষ্কার উদ্ভাবনার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতাকে আরও সমৃদ্ধতর স্তরে নিয়ে পৌঁছান। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একটি উপাত্ত উদ্ভাবন

করেন। এই উপাত্ত ভবিষ্যৎ জ্যোতির্বিদ্যার জন্যে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। এমনকি কপারনিকাসকেও তাঁর এই উপাত্তের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এর উদ্ভাবক এই উপাত্ত উৎসর্গ করেছিলেন এর পৃষ্ঠপোষকের নামে। অদম্য হালাকু খান ইল খান নামেও পরিচিত ছিলেন। সে জন্যে এই উপাত্ত বা টেবল-এর নাম দেয়া হয় 'Jij-Ilkhani।

এই মহান উদ্ভাবকের পুরো নাম আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আল-হাসান নাসির উদ্দিন আল-তুশি। আল-তুশি'র জন্ম ১২০১ খৃষ্টাব্দে। খোরাশানের তুশ প্রদেশে তিনি জন্মান। তিনি আল-তুশি নামেই সমধিক পরিচিত। আল-তুশি অনুপম জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর অসাধারণ জ্ঞানার্জনের জন্যে। তিনি গণিত জগতের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। চিকিৎসা বিদ্যায়ও তিনি অর্জন করতে সক্ষম হন অগাধ জ্ঞান। আইনবিদ্যা ও নীতি-দর্শন বিদ্যায়ও তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি অর্জন করেন অসাধারণ সাফল্য। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অবদান অপরিমেয়। ত্রিকোণোমিতিতেও তার অবদান একই ধরনের। তিনি সে সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিত কামাল উদ্দিন ইবনে ইউসূফ ও সমসাময়িক বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের কাছে শিক্ষা লাভের সুযোগ পান।

তুশি'র কর্মজীবন শুরু নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে। তিনি অন্যান্যের সাথে হাসান বিন সাবাহ এজেন্টদের হাতে গ্রেফতার হন। তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় হাসানের সুরক্ষিত দুর্গ আলমাত-এ। তুশি'র ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার আগেই আলামাত দুর্গ দখল করে নেয় মোঙ্গলেরা। সে সময়টা ছিল ১২৫৬ খৃষ্টাব্দ। তুশি চাকরি পেলেন হালাকু খানের অধীনে। তুশি'র গুণাগুণ ও অসাধারণ জ্ঞানে বিমোহিত হলেন হালাকু খান। হালাকু খান আল-তুশিকে নিয়ে সত্যিই বিস্মিত হয়ে পড়েন। তিনি আল-তুশিকে একজন মন্ত্রীর মর্যাদায় উন্নীত করলেন। হালাকু খানের রাজ্যের ওয়াকফ এস্টেটের দেখা শোনার দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। তুশি তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধনেও মনোযোগী হলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মারামাতে একটি মানমন্দির গড়ে তোলা হলো। এটি রূপ নেয় এক অসাধারণ মানমন্দিরে। এই মানমন্দির জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এই মানমন্দিরে সমাবেশ ঘটেছিল সে সময়ে সর্বোত্তম যন্ত্রপাতির। মোঙ্গল সেনাবাহিনী বাগদাদ থেকে যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিল, সেগুলো এই মানমন্দিরকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। তুসি নিজে উদ্ভাবন করেছিলেন 'টু টায়ার ইনস্ট্রুমেন্ট'। তার নাম দেয়া হয়েছিল 'তারগুয়ায়েত'। একটানা বারো বছর তুশি সে মানমন্দিরে কাজ করেন। তাঁর ছিল বেশ ক'জন সহযোগী। লেখার সাধনা বৃথা যায়নি তাঁর। তিনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন জ্যোতির্বিদ্যার এক অনন্য

উপাত্ত। তুশি ৩০ বছর সাধনা করে এই উপাত্তের কাজ সম্পন্ন করেন। হালাকু খান চেয়েছিলেন আল-তুশি এই উপাত্ত বা টেবলটি ১২ বছরে সম্পাদন করুন।

তুশিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি টলেমীয় জ্যোতির্বিদ্যার ভুল-ত্রুটি ধরতে সক্ষম হন। তিনি এগুলো সংশোধনও করেন। কোপারনিকাস তা অনুসরণ করেন। তুশি'র আইন বিদ্যা বিষয়ক বই আল-তুশির নাম ব্যাপকভাবে পরিচিত করে তোলে। এই বইটির নাম ছিল : Akhlak-E-Namiree। কয়েক শতাব্দী ধরে এই বইয়ের জ্ঞান ছিল শিক্ষার্থীদের জ্ঞানাধার। এটি ছিল একটি বিখ্যাত বই। বইটি অসাধারণ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। তিনি ইসলামী দর্শন সম্পর্কে একটি সৃজনশীল বই লিখে গেছেন। এর নাম : Tajrid-al-Akhlak। এই বইটিও খুব জনপ্রিয় ছিল।

তাঁর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা সম্পর্কিত বইয়ের সংখ্যা অজানা। ব্রুকম্যানের মতে, তাঁর বইয়ের সংখ্যা ৫৬। শার্টন বলেছেন, এ সংখ্যা ৬৪। এর চার ভাগের এক ভাগই জোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত। বাকিগুলো অন্যান্য বিষয়ের। বইগুলো আরবিতে ও ফার্সিতে। এগুলোর অনুবাদ হয়েছে লাতিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায়। এগুলো ছাপা অবস্থায় পাওয়া যেতো।

তুশিকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা চলতে পারে না। তিনি শেষ জীবনে বাগদাদ গিয়েছিলেন। এই নগরী একদিন তার পৃষ্ঠপোষক হালাকু খানই লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। সম্ভবত তিনি ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তার মৃত্যুতে যেনো একটি আলোকবর্তিকার পতন ঘটলো।
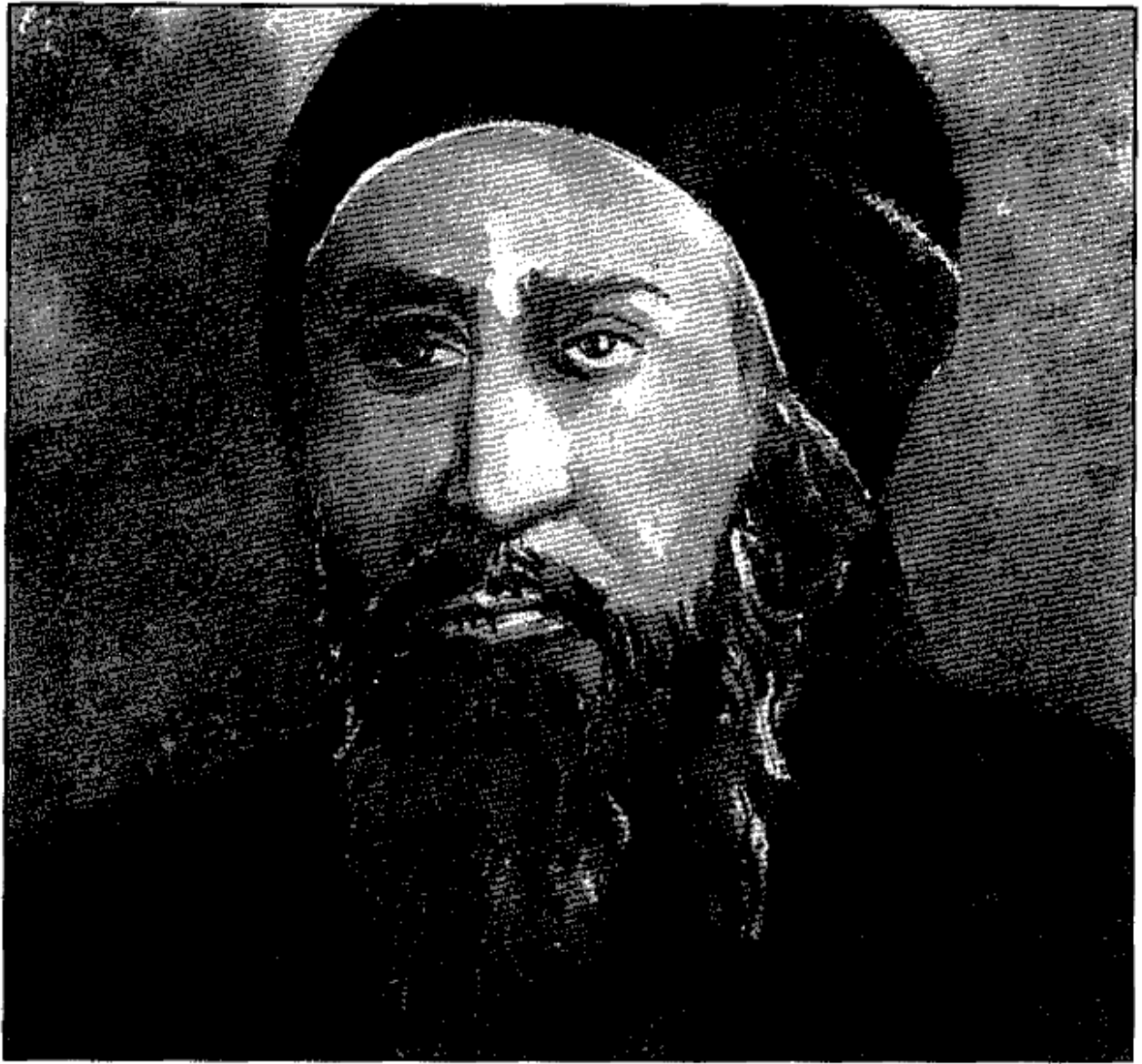
ইবনে রুশদ
আধুনিক সার্জারির জনক

ইবনে রুশদ। আধুনিক সার্জারির জনক। সেই সাথে ছিলেন একজন বড় মাপের আধ্যাত্মিক পুরুষ। কাজে কর্মে ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর দাস। তাঁর বিশ্বাস : 'I give bandage, Allah will heal the wound— আমি ক্ষতস্থান বেঁধে দেবো, ক্ষত সারাবেন আল্লাহ'। এই বিশ্বাসই তাঁকে অনেক অনেক ওপরে ওঠার সুযোগ করে দেয়। হয়ে ওঠেন আল্লাহর প্রিয় পাত্র। তাঁর পুরো নাম 'আবুল ওয়ালিদ মোহাম্মদ ইবনে আহমেদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে রুশদ'। তিনি পাশ্চাত্যে সমধিক পরিচিত ছিলেন Averros নামে। জন্ম কর্ডোভায়। ১১২৮ খৃষ্টাব্দে। সেখানে তাঁর বাবা ছিলেন বিচারক। দাদা মালেকী সম্প্রদায়ের ইসলামী আইন বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন কর্ডোভার জামিয়া মসজিদের ইমাম। যুবক ইবনে রুশদ প্রাথমিক পর্যায়ের লেখাপড়া করেন কর্ডোভাতে। তিনি জ্ঞান আহরণে

ছিলেন পুরোপুরি আত্মনিবেদিত। তিনি ব্যাপকভাবে লেখাপড়া করেন দর্শন ও ভেষজ বিষয়ে। লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন দুই বিখ্যাত শিক্ষকের কাছে। এরা হচ্ছেন : আবু জাফর হারুন এবং ইবনে রাজা। তিনি সুযোগ পান কর্ডোভা পাঠাগারে পড়াশোনার। এই পাঠাগারে ছিল ৫ লাখ বইয়ের সমাহার। এই বিপুল সংগ্রহের অনেক মৌলিক বই তিনি সেখানে পাঠ করেন। এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন আল হাকাম। তিনি ছিলেন স্পেনের উমাইয়া বংশীয় বিখ্যাত খলীফা। তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হলে তাকে ডেকে নেয়া হয় মরক্কোতে। আর ইয়াকুব সেখানে তাকে তাঁর চিকিৎসক পদে নিয়োগ দেন। তিনি ইবনে তোফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হন।

আসলে সেখানেই সূচনা ঘটে ইবনে রুশদের বিজয় অভিযান। সে সূত্রে তিনি হতে সক্ষম হন সার্জারীর জনক। তিনি এ দায়িত্ব অব্যাহত রাখেন খলীফা ইয়াকুব আল মনসুর-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে। আল মনসুর ছিলেন খলীফা ইবনে ইয়াকুবের পুত্র। তবে অভিযান খুব একটা সহজ ছিল না। পরিণত হয়ে ওঠলে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন। তাঁর মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর জীবনে নেমে আসে অভিশাপ। তিনি নির্বাসনে গেলেন লুসিয়ানায়। শুধু একান্ত বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলো ছাড়া তাঁর বাকি বইগুলো পুড়িয়ে দেয়া হল। তিনি নির্বাসনে কাটান চার বছর। এরই মধ্যে তাঁর ব্যাপারটি নিয়ে মধ্যস্থতায় নামলেন বেশ ক'জন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতবর। তাদের ওকালতিতে ইবনে রুশদের ওপর থেকে নির্বাসন আদেশ প্রত্যাহার করে নেন মরক্কোর শাসক। ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে তাকে ডেকে আনা হলো মরক্কোতে। কিন্তু তিনি তাঁর নির্বাসন আঘাতের ধাক্কা পুরোপুরি সামলাতে পারলেন না। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো। এ বছরেরই শেষ দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইবনে রুশদ মানব জাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ : 'কিতাব আল কুলিয়াত ফি আল তিব্বি'। চিকিৎসা শাস্ত্রে এটি একটি মাস্টার ওয়ার্ক। এতে রয়েছে চিকিৎসা শাস্ত্রের তিনটি মৌল বিষয় : রোগ বিশ্লেষণ (ডায়োগনোসিস), নিরাময় (কিউর) এবং প্রতিরোধ (প্রিভেনশান)। বইটিতে ইবনে সিনার 'আল-কানুন' সম্পর্কে সর্বশেষ উল্লেখ রয়েছে। এতে ইবনে রুশদের আসল পর্যবেক্ষণের বিষয় বিধৃত আছে। ইবনে রুশদ এই বইটি লিখেন ১১৬২ খৃস্টাব্দের আগে।

একজন অনন্য দার্শনিক হিসেবে ইবনে রুশদ বিভিন্ন বিষয়ে স্বতন্ত্র মতবাদ পোষণ করতেন। তাঁর চিন্তা ভাবনা সূত্রে আমরা পেয়েছি আধুনিক দর্শন ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের পথ। তিনি চেষ্টা করেছেন মানুষের ভাগ্য ও গন্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে যেতে। তাঁর অভিমত হচ্ছে 'Man is neither in full control of his destiny nor it is fully predetermined for him'। এর সার কথা হচ্ছে মানুষ পুরোপুরি ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং ভাগ্যটা পুরোপুরি

আগে থেকে নির্ধারিতও নয়'। ইবনে রুশদের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে 'তুহাফুত আল তুহাফুত'। এটি ইমাম গাজ্জালীর লেখাসমূহের জবাবে দর্শন বিষয়ক বই। তাঁর এই বই অনেক মুসলিম পণ্ডিতদের সমালোচনার মুখে পড়ে। কিন্তু তা ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনায় প্রভাব ফেলে। তিনি অ্যারিস্টটলের কাজের ওপর তিনটি সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যে সবচে' ছোট সমালোচনামূলক লেখাটি ছিল 'জামি'। মাঝারি আকারের বইটি 'তালখিস' এবং বিস্তারিত বইটি ছিল 'তাফসিস'। আসলে 'তাফসিস' ছিল তাঁর মূল অবদান। এতে আবু রুশদ তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। এই বিশ্লেষণের ভিত্তি ছিল কোরানের ব্যাখ্যা।

'কিতাব ফি হারাকাত আল ফালাক' হচ্ছে ইবনে রুশদের জোতিবির্দ্যা বিষয়ক একটি বই। এই বইয়ে ভূমন্ডলের গতি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। তাঁর লেখা বই 'আল মাজেস্ট' দু'খণ্ডে বিভক্ত। এক খণ্ডে বর্ণনা আছে ভূমণ্ডলের। অন্য খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ভূমণ্ডলে গতির বিষয়টি। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে এই বইটি আরবি থেকে হিব্রু ভাষায় অনুবাদ হয়। এর অনুবাদক ছিলেন ইয়াকুব আনাতুলি। অন্য পরিচয়ে জেকব আনাতুলি। ইবনে রুশদ জ্ঞান অর্জন করেন সঙ্গীতের জগতেও। তিনি অ্যারিস্টটলের সঙ্গীত বিষয়ক বই De Anima'র সমালোচনা করে বই লিখেন। মিশেল দ্যা স্কট নামে জনৈক অনুবাদক এটি লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইবনে আল আব্বার বলেছেন, ইবনে রুশদ ২০ হাজার পৃষ্ঠার বই লিখে গেছেন। এগুলো মূলত দর্শন, চিকিৎসা ও মৌলিক আইন বিষয়ক বই। শুধু চিকিৎসা বিষয়ে তিনি লিখেছেন, ২০টির মতো বই। ইবনে রুশদের দর্শন বিষয়ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে : 'বিদায়াত আল মুস্তাসেদ ওয়া নেহায়েত আল মুকতাসেদ।' মালেকী সম্প্রদায়ের ফিকাহ্ শাস্ত্রে একে সর্বোত্তম বই হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইবনে রুশদের বইগুলো মূলত অনুবাদ হয়েছে ইউরোপীয় লাতিন, ইংরেজি, জার্মান, হিব্রু ইত্যাদি ভাষায়। তার দর্শন বিষয়ক বইগুলো হিব্রু ভাষায় সংরক্ষিত আছে। সামান্য ক'টি বই পাওয়া যায় মূল আরবি পাণ্ডুলিপি আকারে। প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যে ছিল তাঁর বেশি গ্রহণযোগ্যতা। প্ল্যাটোর রিপাবলিক, গ্যালেন-এর ট্রিটিজ অন ফিভারস, আল ফারাবীর লজিক সম্পর্কে তাঁর সমালোচনামূলক লেখাগুলো হারিয়ে গেছে। তাঁর প্রাচ্য বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা ৮৭টি। ইবনে রুশদকে দ্বাদশ শতকের একজন শীর্ষ সারির চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আল-ফারগানি

ফলিত প্রকৌশলের অগ্রদূত

আমরা আজ পৃথিবী নামের যে গ্রহটিতে বসবাস করছি, সে গ্রহ সম্পর্কে আমাদের জানা নানা দিককেন্দ্রিক। কিন্তু এক সময় মানুষ পৃথিবী নামের গ্রহটির ব্যাস কত, তাও জানতো না। প্রথম মানুষ কী করে এর ব্যাস সম্পর্কে জানলো, তা নিয়ে কখনও আমরা কী ভেবে দেখেছি? আর এও কী জানি, একাজটি প্রথম সম্পাদন করেন একজন মুসলিম বিজ্ঞানী। এই বড় মাপের আবিষ্কারটি করেন আবুল আব্বাস আহমেদ ইবনে-মোহাম্মদ ইবনে কাত্তির আল-ফারগানি। তিনি জন্মেছিলেন ট্র্যান্স অক্সিয়ানার ফারগানায়। ফারগানা হচ্ছে তাসখন্দের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি উপত্যকা। তাঁর জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তবে ঐতিহাসিক দলিলপত্র ঘেটে জানা যায়, তিনি খলিফা আল-মামুনের অধীনে একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন।

আল ফারগানি জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়নে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত সুদক্ষ প্রকৌশলী। ফারগানি দেখিয়েছিলেন, পৃথিবী নামের গ্রহের ব্যাস ৬৫০০ মাইল। তিনি অন্যান্য গ্রহের ব্যাসও মাপতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সবচে' দূরের ইন্টার-প্ল্যানেটারী ডিসটেন্স বা আন্তঃগ্রহের দূরত্ব পরিমাপ করেছিলেন।

সৌর ব্যবস্থায় গ্রহ-উপগ্রহ কীভাবে পরিভ্রমণ করছে, তার ওপর একটি বই লিখে গেছেন তিনি। সেখানে তিনি ছায়াপথ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এটি এ ক্ষেত্রে একটি অনন্য বই। বইটির নাম 'জাবামি লিম আল নুজম'। দ্বাদশ শতকে এই বইটি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। এটি 'এলিমেন্টস অব এস্ট্রোনমি' নামে সুখ্যাতি অর্জন করে। দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপে এটি ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক অন্যতম প্রধান বই। বলা যায় প্রতিনিধিত্বশীল বই। তার সবচে' বিখ্যাত বই হচ্ছে ঝামী বা Jhamee। এর অর্থ elements। তাঁর অন্য দু'টি বিখ্যাত বইয়ের একটি 'কিতাব আল ফাসুল ইখতিয়ার আল মাজিস্তি' অথবা 'The book of Chapreens'। এটি আল মাজিস্ট-এর সার সংক্ষেপ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'কিতাব আল আইরুখামাত' অথবা Book on the Construction of Sun-dials। সবগুলো বই-ই লাতিন ভাষায় ভাষান্তর হয়েছে। পরবর্তী সময়ের ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদেরা তাঁর এসব অনুবাদিত বইয়ের কাছে ব্যাপকভাবে ঋণী। ৯৬৭ খৃষ্টাব্দে আব্দুল আজিজ আল কারিমী ফারগানির বই 'জামি' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এর পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল জাদুঘরে এখনও পাওয়া যায়। একজন প্রকৌশলী হিসেবে ফারগানি তত্ত্বাবধান করেছিলেন পুরোনো কায়রোর আল ফুসটাট-এর Great Nilometer -এর নির্মাণ কর্ম। এই নিলোমিটার ছিল ট্রাইগ্রিস থেকে পানি আনার একটি খাল খনন পরিকল্পনা। এ খাল কাটা শেষ হয় ৮৬১ খৃষ্টাব্দে। খলিফা মুতাওয়াক্কুল এ খাল খননের আদেশ দিয়েছিলেন। এটা ছিল অবাক করা এক প্রকৌশল কর্ম। তখন পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটেনি। খলিফা মুতাওয়াক্কুলকে ইতিহাসে অভিহিত করা হয় Niro of the Arabs বা আরবের নিরু। তাকে হত্যা করা হয় ৮৬১ খৃষ্টাব্দে। ফারগানি প্রকৌশল ও প্রযুক্তিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে বলা হয় Pioneer in Applied Engineering বা ফলিত প্রকৌশলের অগ্রদুত।

এই মহান বিজ্ঞানীর শেষ জীবনের দিনগুলো সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে তিনি সাফল্যের সাথে খলিফা মুতাওয়াক্কুলের নির্যাতন মোকাবিলা করেছিলেন। তিনি অদম্যভাবে বরাবর চলে গেলেন জ্ঞানার্জনের পথে।

ইবনে খালদুন
সমাজ বিজ্ঞানের জনক

আবু জাইদ আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন। তাকে বলা হয় সমাজ বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জনক। তিনি ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলে মনে করতেন। তাঁর কল্পিত ইতিহাস-বিজ্ঞান ছিল সমাজ ও সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের বিজ্ঞান। তিনি এনাল্‌স বা গতানুগতিক বর্ষপঞ্জি ও ইপিসোডিক্যাল হিস্ট্রি বা কাহিনীমালার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি ছিলেন একজন ইতিহাস দার্শনিক। আধুনিক ইতিহাস-দর্শনের ইতিহাসে তিনি এক অনন্য সাধারণ ও অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। ইবনে খালদুন নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। জন্ম ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে। মৃত্যু ১৪০৬-এ। আরনল্ড টয়েনবি ও রবার্ট ফ্লিন্ট প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি দেশ, কাল, পাত্রভেদে সর্বাপেক্ষা চমৎকার ও তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস দর্শনের প্রণেতা এবং প্লেটো, অ্যারিস্টটল বা অগাস্টিনও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।

তিনি 'কিতাব-আল-ইবার' নামে লিখে গেছেন উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের ইতিহাস। এ বইয়ের মুখবন্ধে তিনি ইতিহাস জ্ঞানের জটিলতা সম্পর্কে এক জ্ঞানগর্ভ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দাঁড় করান। এই ভূমিকাটি আজও তাকে এ ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় করে রেখেছে।

আলজেরিয়ার 'কালাত ইবনে সালামাহ' দুর্গে ১৩৭৫-৭৮৯ সময় পরিধিতে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে তিনি এই ভূমিকা বা মুকাদ্দিমা রচনা শেষ করেন। তাঁর মূল পরিকল্পনা উত্তর আফ্রিকার আরব ও বারবারদের ইতিহাস 'কিতাব-আল - ইবার' লেখা শেষ হয় আরও পরে। তা লেখা শুরুর আগে তিনি ইতিহাসের সত্যকে অন্যান্য মিথ্যাচার থেকে আলাদা করার তাগিদ অনুভব করেন। সে তাগিদ থেকেই তিনি ইতিহাস-জ্ঞানের প্রকৃতি ও ধারা পর্যালোচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং উল্লিখিত মুখবন্ধ বা মুকাদ্দিমায় তাঁর অভিমত ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন। আরও দেখা যায়, তিনি সমাজ ও সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক নতুন বিজ্ঞান 'ইলম আল উমরান' বা সংস্কৃতির বিজ্ঞান বা সায়েন্স অব কালচার আবিষ্কার করেন। এই নতুন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো মানব সমাজ। আর সমস্যা হিসেবে দেখা যায়, সতত সামাজিক বিবর্তনের বীজ সমাজের প্রকৃতিতেই বর্তমান থাকে।

ইবনে খালদুন মুকাদ্দিমায় উপস্থাপিত বিষয়াবলী ৬ অংশে ভাগ করে আলোচনা করেন। প্রথম ভাগে সমাজ বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয় । এখানে সামাজিক শ্রেণী ও ভৌগোলিকভাবে মানুষের বিভাজন সম্বন্ধে জানা যায়। দ্বিতীয় ভাগে তিনি যাযাবর সমাজ, গোত্র ও অনগ্রসর জাতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনায় আসেন। তৃতীয় ভাগের বিষয়বস্তু হিসেবে পাওয়া যায় রাষ্ট্র, আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রীয় পদবীসমূহ। চতুর্থ ভাগে স্থায়ী সমাজ, নগর ও প্রদেশের পর্যালোচনা মিলে। পঞ্চম ভাগে মানুষের কারুকাজ, জীবিকা উপার্জনের উপায় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। পরিশেষে ষষ্ঠ ভাগে পাওয়া যায় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা। মোট কথা, এ ছয় ভাগের প্রত্যেক ভাগে সামগ্রিকভাবে সর্বত্র ইতিহাস তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা নীতির ওপর বহু জ্ঞানদীপ্ত পর্যবেক্ষণ ছড়িয়ে আছে। অন্যভাবে বলা যায়, এখানে মানব সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের এক অনন্য সুন্দর আলেখ্য বর্তমান।

ইবনে খালদুন মুকাদ্দিমায় যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ। এখানে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। তিনি বলে গেছেন, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মাঝামাঝি জায়গাটা মানুষের জন্যে সবচে' বেশি উপযোগী। তিনি জোর দিয়ে বলেন, কোনও মানুষ একা জীবন ধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এ জন্যে প্রয়োজন পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা। ইবনে খালদুনের মতে, পরিপূর্ণ

সহযোগিতা এক জটিল সামাজিক বিবর্তনের সৃষ্টি করে, যাকে তিনি নগরায়ণ বলে আখ্যায়িত করেন।

ইবনে খালদুন দেখান, রাজবংশ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন অধিক সংখ্যায় লোক সমাগম। তাই বিকশিত সভ্যতার মধ্যেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে শাসকবর্গের বড় বড় শহর, নগর ও বন্দরের প্রয়োজন হয়। স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে এরা বিলসিতা আর আরাম-আয়েশের প্রতি নজর দেয়। মানুষকে বিলাস সামগ্রীর তৈরিতে উৎসাহিত করে। এর ফলে কারুশিল্প, বিভিন্ন কলা-কৌশল ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁর মতে, অতি বিলাসপ্রিয়তা রাজবংশের অবক্ষয় ও পতন নিশ্চিত করে। কারণ, বিলাস-ব্যসনের জন্যে প্রয়োজন হয় অগাধ ধনসম্পদ।

ইবনে খালদুন ছিলেন ব্যাপক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এক মানুষ। তাঁর মা-বাবা ছিলেন ইয়েমানী আরব। তাঁরা স্পেনে গিয়ে স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলেন। সিডেলি'র পতনের পর তারা চলে যান তিউনিসিয়ায়। ইবনে খালদুনের জন্ম সেখানেই। সেখানে শৈশব ও শিক্ষা জীবন কাটান। এরপর যোগ দেন মিসরীয় সুলতান বারফুকের সার্ভিসে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর। খুব শিগগির জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশে তিনি সে চাকরি ছেড়ে দেন। তিনি চলে যান মরক্কোর রাজধানী ফেজ-এ। দুর্ভাগ্য তার পিছু নিলো। ফেজ-এ তখন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে রাজনৈতিক অস্থিরতা। রাজ পরিবারের সদস্যারা লিপ্ত ছিল ক্ষমতার জটিল-কুটিল নানা খেলায়। সেখানে শান্তি ও সহনশীলতার ছিল বড়ই অভাব। কিন্তু জ্ঞান অর্জনে ইবনে খালদুনের উৎসাহে ছিল না বিন্দুমাত্র ভাটা। এ সময় তিনি নিরাপদ আশ্রয় পান আলজেরিয়ার 'কালাত ইবনে সালামত' দুর্গে। ছোট দুর্গ গ্রামে ৪ বছর নিরাপদে অবস্থান করেই লিখেন আল মুকাদ্দিমা। শিগগিরই বইটি যথারীতি প্রকাশিত হলো। সেখান থেকেই শুরু হলো ইবনে খালদুনের উত্থান যাত্রা। তবে তাঁর চারপাশে ছিল এক অব্যাহত অনিশ্চয়তা। ফিরে এলেন মিসরে। আসীন হলেন এক সম্মানিত পদে। তিনি হলেন মালেকী কানুনের প্রধান কাজী। সেই সাথে কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু তার শত্রুরা ছিল সমভাবে ঈর্ষান্বিত ও সক্রিয়। পর পর ৫ মেয়াদের পর তাঁকে কাজীর আসন থেকে নামানো হলো।

ইবনে খালদুন একজন গণিতবিদও ছিলেন। গণিত বিষয়ে তিনি ব্যাপক কাজ করেছেন। গণিত বিষয়ে তার বইগুলো ইতোমধ্যেই হারিয়ে গেছে। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে তাঁর অনেক বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। এসব বইয়ের মাধ্যমে ইবনে খালদুনের নাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।
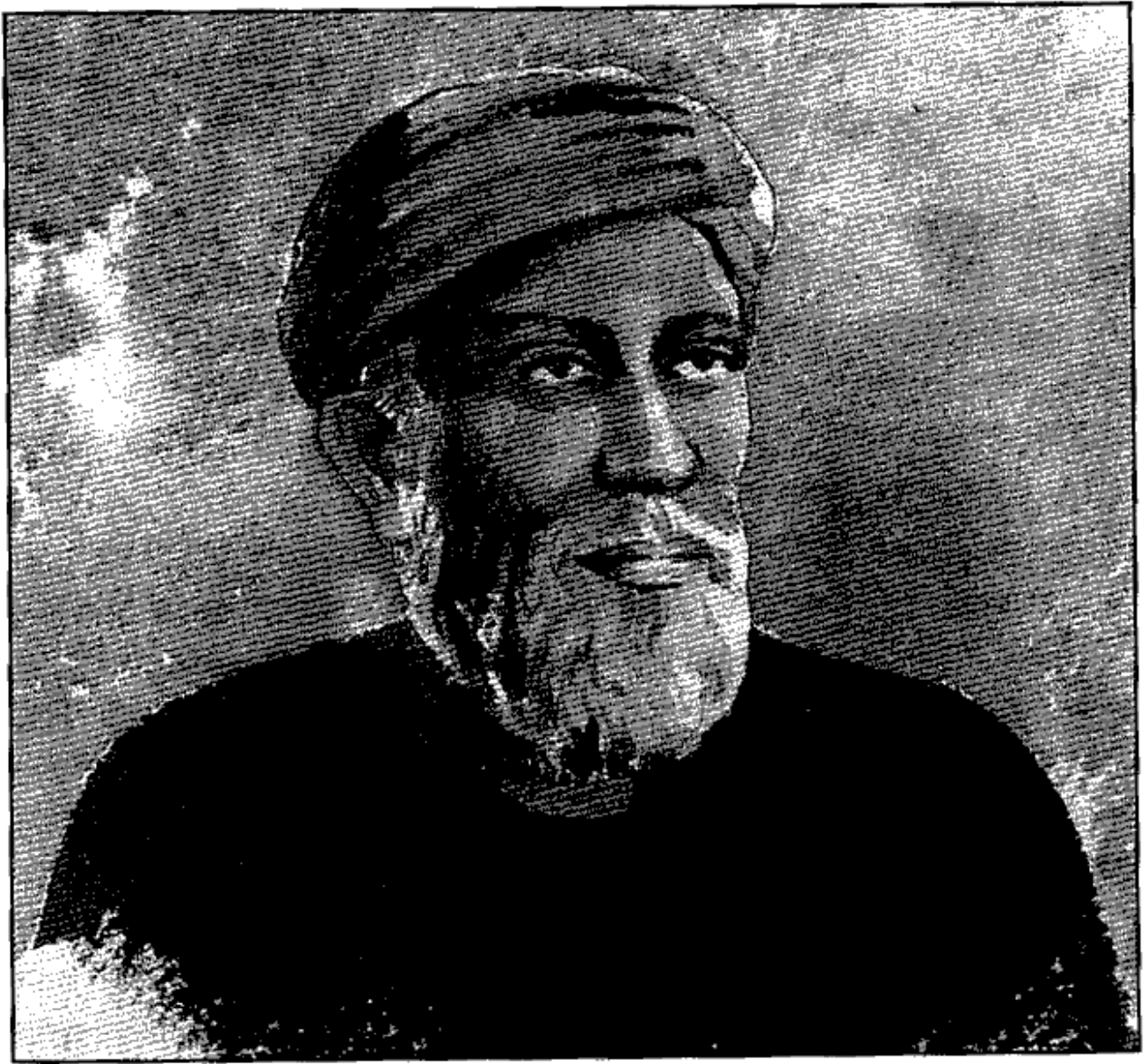
আল-বেরুনী

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের প্রথম যথার্থ বর্ণনাকারী

আল-বেরুনী। পুরো নাম আবু রায়হান মোহাম্মদ বিন আহমে আল-বেরুনী। বিখ্যাত জ্ঞানকোষ প্রণেতা, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক বিজ্ঞানী। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার কালক্রম নিরূপণে সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তিতে ঘটনা প্রবাহের তারিখ স্পষ্ট ও নিয়মানুগ করার প্রয়াস চালান। জোসেফ জোস্টাস স্ক্যালিগারের আগে ১৫৪০-১৬০৯ সময় পরিধিতে খৃষ্টান জগতে আল-বেরুনীর সমকক্ষ দ্বিতীয় কোনো কালক্রম গণনাকারী ছিল না। দশম শতাব্দীর প্রজ্ঞার জগতে আল-বেরুনী এক উজ্জ্বল তারকা। তার বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ পুরোপুরি ছিল বিশ্বাসভিত্তিক। তিনি অন্তরে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ সবই জানেন। অতএব, আল্লাহর বান্দা অবশ্যই অজ্ঞ থাকতে পারে না। তিনি তাঁর এ বিশ্বাস লালন করে চার দশক ধরে বিচরণ করেন জ্ঞানের পথে। তাঁর জীবন

ছিল ঐশ্বরিক শুভাশীযসমৃদ্ধ। তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল পদার্থবিদ্যা, গণিত, ইতিহাস, ভুগোল এবং অধিবিদ্যায় এবং অধ্যয়ন করেছেন আবু সিনা।

গজনীর সুলতান মাহমুদ জয় করেন খিভা। খিভা হচ্ছে উজবেকিস্তানে আমুদরিয়ার নিম্নভাগের একটি স্থান। তখন আল-বেরুনীর খ্যাতি চারদিকে। মাহমুদ তাকে সাথে নেন। তাকে বসানো হয় রাষ্ট্রীয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদে। আল-বেরুনী বেশ কয়েকবার সুলতান মাহমুদের সাথে ভারত সফর করেন। তিনি ব্যাপকভাবে সফর করেন পরবর্তী দুই দশক সময় পরিধিতে। এ সময় জ্ঞান বিনিময় করেন ভারতীয় পণ্ডিতদের সাথে। গণিত, ভূগোল, আধ্যাত্মিক দর্শন বিষয়ে। তিনি হিন্দু ধর্ম দর্শন সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এর বিনিময়ে তিনি ভারতীয় পণ্ডিতদের শেখান গ্রীক ও আরবদের বিজ্ঞান ও দর্শন।

আল-বেরুনীর লেখা 'কিতাব আল-হিন্দ' বইটি এ উপমহাদেশের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের ওপর এক দুষ্প্রাপ্য উপস্থাপনা। তিনি নিজে দু'টি বইয়ের অনুবাদ করেছিলেন সংস্কৃত ও আরবী ভাষায়। একটি 'সাক্ষ্য' অন্যটি 'পতঞ্জলি'। 'সাক্ষ্য'-তে আলোচনা করা হয়েছে পদার্থের সৃষ্টি ও ভিন্নতা নিয়ে। আর 'পতঞ্জলি'-তে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে দেহ ও আত্মা সম্পর্কে। আত্মার পলায়নের পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়। ভারত বিষয়ে আল-বেরুনীর লেখার সম্মানজনক স্বীকৃতি জানিয়েছেন ঐতিহাসিক আবুল ফজল। আবুল ফজল ছিলেন সম্রাট আকবরের দরবারের সরকারি ঐতিহাসিক। আল-বেরুনী ছয় শ' বছর পর আবুল ফজল লিখেন আইন-এ-আকবরী। এটি একটি উল্লেখযোগ্য বই। আইন-এ-আকবরী-তে আল-বেরুনীর কিতাব আল-হিন্দ থেকে প্রচুর তথ্য নেয়া হয়। আর-বেরুনী যথার্থভাবে বর্ণনা করে গেছেন সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার উৎপত্তি সম্পর্কে।

আর-বেরুনীর অবাধ বিচরণ ছিল জ্যোতির্বিদ্যা ও ত্রিকোনমিতির জগতে। সূর্য ও চাঁদের গতি সম্পর্কে তার আবিষ্কার খুবই অবাক করার মতো। এ বিষয়ে তিনি যে বইটি লিখে গেছেন, তেমন বই খুব কমই চোখে পড়ে। এই বইটির নাম 'কানুন-এ-মাসুদী'। বেশ কিছু সময় এ বইটি পরিচিত ছিল 'আল-কানুন আল-মাসুদী আল-হাওয়ায়া-আল-'নুজুম' নামে। তিনি বইটি সুলতান মাসুদের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। পেছনের বিষয় গভীর গবেষণার মাধ্যমে উন্মোচন করার কৌশল তিনি জানতেন। তিনি প্রাগৈতিহাসিক সময়ের সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা করতেন। সাফল্যের সাথে তিনি চিহ্নিত করতে পেরেছেন প্রাচীন প্রজন্মকে। জাতিগোষ্ঠীকে এবং জীবনযাপন প্রণালী ও বসবাস পদ্ধতিকে। বিশ্বের প্রজ্ঞার রাজ্যে তার এ অবদান অমূল্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত।

আল-বেরুনী ও ইবনে হিশাম আধুনিক বিজ্ঞানে মৌল গতিধারার সূচনা করেন। এরা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃত স্থপতি। দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের প্রথম যথার্থ বর্ণনা তুলে ধরেন আর-বেরুনী। জিও-ইকোনমিকস বা ভৌগলিক অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট আকার দেন এই অসাধারণ মেধাবী বিজ্ঞানী। এ বিষয়ে তার বইয়ের নাম 'আল-আতাহার আল-বাকিয়া'। ঘনত্ব ও আকার দৃষ্টে তিনি আবিষ্কার করেন ১৮টি দামী পাথর। জুয়েলারী বিষয়ে তার গবেষণা সবাইকে অবাক করে দেয়। হীরা, মুক্তা, রত্ন ও অন্যান্য দামী পাথর ছিল তার গভীর ও ব্যাপক গবেষণার বিষয়। এই বিষয়ে তিনি যে বই লিখে গেছেন তার নাম 'কিতাব আল জামাহির'। শারীরবিদ্যা ও ওষুধ সম্পর্কিত তাঁর বই একটি অনন্য ভাণ্ডার। এতে ম্যাটেরিয়া ও মেডিকার সবকিছুর মধ্যে সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। এই বইটির নাম দেয়া হয়েছে 'কিতাব আল-সাইয়েদেনা'। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আরবীয় শরীরবিদ্যার জ্ঞান। আছে সেই সাথে ভারতীয় ভেষজ বা ওষুধ সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা।

জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তার প্রজ্ঞা ভবিষ্যৎ বক্তার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাকে বিবেচনা করা হয় একজন বাস্তব-বক্তা বলে। একটি জ্যামিতিক কোণকে তিনভাগে ভাগ করার পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। পৃথিবী যে তার আপন অক্ষের উপর ঘুরছে, তা আমাদের জানাতে তিনি ছিলেন অগ্রদূত। শতাব্দী সময় পর সবাই সে সত্যের উপলব্ধি করেন। তিনি আরো একটি উল্লেখযোগ্য সত্যের উন্মোচন করেন। তিনি আলোর গতি ও শব্দের গতির পার্থক্য চিহ্নিত করেন।

প্রাকৃতিক ঝরনা ও কৃত্রিম কূপের রহস্যের বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথম সমাধান দেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে তিনি নানা সত্য উদঘাটন করেন। তিনিই প্রথম সবাইকে জানান, বিভিন্ন ফুলের পাপড়ি সংখ্যা ৩, ৪, ৫, ৬ অথবা ৮টি হয়ে থাকে। পাপড়ি সংখ্যা কখনওই ৭টি কিংবা ৯টি হয় না।

জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত বিষয়ে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত বইয়ের নাম 'আল-তাফিম লী-আওয়াইল-সিনাত-আল-তাঞ্জিম'।

তাঁর গবেষণার অপরিহার্য নীতি ছিল 'সত্যের আবিষ্কার'। সারা জীবন ছিলেন সে লক্ষ্যে উৎসর্গীত। ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

আল-গাজ্জালী

ধর্ম ও দর্শনের এক মহান শিক্ষক

খৃষ্টীয় একাদশ শতকে এসে ধর্ম হিসেবে ইসলামের ধ্রুপদ পুনর্জন্ম ঘটলো। তখন ইসলামের সত্যিকারের ধারণা এবং আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো হয় যথার্থ সঠিক প্রেক্ষিতে। ইসলাম ধর্মের প্রচারক পবিত্রতম নবী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে উপহার দিলেন পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আর এই পরিপূর্ণ জীবন বিধানের নাম ইসলাম। আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিবেচনায় ইসলামের রয়েছে শাশ্বত মূল্য। ইসলামী রীতি-নীতির এলোপাতাড়ি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে খোলাফায়ে রাশেদীন-উত্তর সময়ে একটা গোলমেলে পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। ইসলামী রীতি-নীতি মুল্যবোধ তাই আবার নতুন করে পূনরুদ্ধার করতে হয়েছে। তিনি ইসলামী থিওসোপী বা অধ্যাত্মিক জ্ঞান, দর্শন ও সুফীবাদকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। তিনি সবক্ষেত্রে জ্ঞান

লাভের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করেছিলেন। তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন প্রজ্ঞার অসীম জগতে। সুফীদের সর্দার এই মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় আবু মোহাম্মদ আল-তুশী আল-শফিত আল-গাজ্জালী রহমুতুল্লাহে আলাইহি। তিনি ইরানের খোরাশানে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে। শৈশবেই তিনি বাবাকে হারান। কিন্তু শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন বাগদাদের নিশাপুরে। খুব অল্প সময়েই তিনিই পাণ্ডিত্যের শীর্ষ পর্যায়ে পৌছান।

তিনি হন ধর্ম ও দর্শনের এক মহান শিক্ষক। তাঁর পাণ্ডিত্য হয় সর্বজন স্বীকৃত। নিয়োগ পান বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে। মুসলমানদের জ্ঞান-গরিমার স্বর্ণ-যুগে এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল একটি উঁচু সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গাজ্জালী প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণের মধ্যেই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেননি। তিনি সাহচর্যে এলেন হযরত আবু আলী ফারমেদী রাজিআল্লাহ আনহু'র। তখন ফারমেদী ছিলেন প্রতিনিধিত্বশীল 'কুতুব'। তিনি বের হয়ে পড়েন আল্লাহর পথে। সে পথ তাকে করে তুললো একজন দরবেশ। দরবেশ হচ্ছেন একজন সূফী ও আধ্যাত্মবাদী। তিনি ঐশ্বরিক প্রজাসমৃদ্ধ হন। এরই মধ্যেই গাজ্জালী পরিপূর্ণ সক্ষম হলেন বিভিন্ন বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা দেয়ার ব্যাপারে। তিনি এসব ফয়সালা দিতেন নির্ভয়ে। এ কারণে, তিনি ইসলামের ভুল ব্যাখ্যাকারী এবং দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের প্রচণ্ড ক্রোধের মুখে পড়েন। তাঁরা তাকে বলতো 'হুজ্জাতুল ইসলাম'। কিন্তু তাঁর অগ্রযাত্রা থেমে যায়নি। তিনি হয়ে ওঠেন প্রশংসিত এক ইমাম।

গাজ্জালীর ধ্যান-ধারণার স্বচ্ছতা ছিল সর্বজন স্বীকৃত। ইসলামী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কিত তাঁর মতবাদকে একটি গাণিতিক উদ্যোগ হিসেবে অ্যারিস্টটলীয় ও নব্য-প্লোটোনীয় মতবাদের অনুসারীরাও মেনে নেয়। তাঁর বিতর্কাতীত পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিগত অলৌকিক অভিজ্ঞতা সূত্রে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন দর্শন ও সুফীবাদের মধ্যেকার সম্পর্কের যথার্থ উদাহরণ সৃষ্টি করতে।

গাজ্জালী সাফল্যের সাথে অ্যারিস্টটলীয় ও নব্য-প্লোটোনীয় দর্শনের ত্রুটি-বিচ্যুতি শোধরান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। তিনি একদিকে এরিস্টটলীয়বাদের নেতিবাচক প্রভাব দূর করেন, অন্যদিকে তিনি লড়াই করেছেন অতিমাত্রার যুক্তির সাথে। তিনি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়ন করেছেন যে, 'The Absolute and the infinite' অর্থাৎ 'পরম ও অসীম'-এর কারণ পুরোপুরী উপলব্ধি করার মতো নয়। তাঁর অভিমত হচ্ছে, তুলনামূলক উপলব্ধির ক্ষেত্রে কারণ খুবই সীমিত পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেয়। তাঁর প্রস্তাব হচ্ছে, 'ইনফাইনাইট টাইম'-এর সাথে 'ইনফাইনিট স্পেস'-এর একটি সম্পর্ক রয়েছে। যুক্তি বা কারণের সাথে ধর্মের একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁকে বিবেচনা করা হয় ভেনগার্ড বা অগ্রদূত। তিনি ধর্ম ও চুক্তির সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেন। তাঁর অভিমত, ধর্ম হচ্ছে

একটা অসীম বিষয়। আর কারণ বা যুক্তি হচ্ছে সমীম। অর্থাৎ রিলিজিওনের বিষয় ইনফাইনাইট আর রিজন-এর বিষয় ফাইনাইট। তিনি সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন 'পরম সত্য' বা 'অ্যাবসলিউট ট্রুথ' উদঘাটন করতে হলে খাটি সুফীবাদের পথে চলা একান্ত প্রয়োজন। তিনি অনুপম বাগ্মীতায় প্রচার করে গেছেন সুফীবাদ। তাঁর মধ্যে সুফীবাদ খুঁজে পেয়েছিল এক নিরাপদ আশ্রয়। এ ক্ষেত্রে ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহে আলায়হে চেষ্টা করেছেন খোদায়ী-সৌন্দর্য মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত করতে। মানুষের মধ্যেকার সুন্দরকে তিনি সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন এভাবে : 'সুন্দর সে, যে সুন্দর কর্মসাধন করে'। ইংরেজিতে বলা যায় : 'Handsome is what handsome does'। কথাটি অন্যভাবেও বলা চলে : কাজ যার সুন্দর, সেই সুন্দর'। তিনি নিজে এই সুন্দরের পথে ছিলেন এক অন্তহীন পরিব্রাজক।

একটি বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন তাঁকে অনেক দূর নিয়ে গিয়েছিল। এক সময় তিনি স্থায়ী আবাস গড়লেন। তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হলেন। এক সময় তাঁর একাকীত্ব জীবনের অবসান ঘটলো। শুরু করলেন শিক্ষকতা জীবন। লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করতেন তার চিন্তা-ভাবনা। তিনি হয়ে ওঠলেন এক উর্বর লেখক। গড়ে প্রতিদিন লিখে চলছেন ১৬ পৃষ্ঠা। বিভিন্ন জটিল বিষয়ে তিনি লিখে গেছেন ৪০০ বই। দর্শন বিষয়ে তাঁর একটি বইয়ের নাম 'তুহাফুত উল-ফালাসিফা'। এর অর্থ 'দর্শনের অসঙ্গতি'। বইটি অনন্য। 'ইয়াহিয়া আল-উলুম আল-ইসলামিয়া' বা 'ইসলামী বিজ্ঞানের পূনরুত্থান', The Begening of Guidance এবং তার জীবনালেখ্য Deiverance From Error হচ্ছে তার কতগুলো অমর বই। তার অনেক বই অনুবাদ হয়েছে অনেক ইউরোপীয় ভাষায়।

ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লা আলাইহি ইসলামী আল্লাহতত্ত্ববিদদের মধ্যে অন্যতম। তার প্রভাব খুবই গভীর ও চিরকালব্যাপী। তাঁর মতবাদ ইউরোপেও ঢুকে পড়ে। ইহুদী ও খৃষ্টান পণ্ডিতেরাও তাঁর অনুসারী হয়ে ওঠেন। এস.টি টমাস ইকুইনাসের মতো পণ্ডিত অর্থোডক্স খৃস্টবাদ কর্তৃত্ব পূনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে গাজ্জালীকে উদ্ধৃত করতেন। বাংলাদেশে ও গাজ্জালীর কিছু বইয়ের অনুবাদ পাওয়া যায়। ইমাম গাজ্জালীর বর্ণনা পুরোপুরি তুলে ধরা অসম্ভব। তার জ্ঞান জগতের ছিটে ফোটা মাত্রা আজও আমাদের কাছে পৌছে।

তাঁর মিশন এক সময় শেষ হলো। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পাড়ি দেন পরপারে। বাগদাদে তিনি মারা যান ১১২৮ খৃষ্টাব্দে। তবে এই পণ্ডিতবর এখনও আমাদেরকে প্রভাবিত করেন প্রবলভাবে।

ইবনে-আল-নাফিস

রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার সত্যিকারের আবিষ্কারক

রক্ত মানুষের শরীরের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের সারা শরীরে অবিরাম বয়ে চলেছে রক্তের নহর। স্বয়ংক্রিয় রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা শরীরের এই অবিরাম রক্তপ্রবাহ নিশ্চিত করছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা মানুষের কাছে ছিল এক অনন্ত বিস্ময়। অজানা এক জগত। এক সময় মানুষ জানতো না ফুসফুসের কথা। জানতো না ফুসফুস কীভাবে কাজ করে। মানুষের শরীরে নিয়ে তাদের মনে তখন ছিল নানা প্রশ্ন। শ্বাস-প্রশ্বাসের কলাকৌশল কী? আমাদের শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস আর রক্ত প্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক কী? এ দুয়ের মধ্যে কী ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। এমনি আরো কত প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছেন এককভাবে একজন মুসলিম বিজ্ঞানী।

বিশ্বখ্যাত এ বিজ্ঞানীর নাম আলাউদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবুল হাসান আল-কুয়ারসি আল-দামেস্কী আল মিস্‌রী।

তাঁর জন্ম ৬০৭ খৃষ্টাব্দে। জন্মেছেন দামেস্কে। ছিলেন নানা গুণে গুণান্বিত এক জন। একদিকে ছিলেন প্রথম সারির চিকিৎসা বিজ্ঞানী। অন্যদিকে দার্শনিক, সাহিত্যিক, বিচারক ও দিব্যজ্ঞানী। জনৈক নুরুদ্দিন জঙ্গী দামেস্কে গড়ে তুলেছিলেন এক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। সেই মহাবিদ্যালয়ে আবুল হাসান ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি ওষুধ ও ওষুধ বিজ্ঞান বিষয়ে শিখেছেন তাঁর শিক্ষক মোহাজ্জাব আল-দিন আব্দুর রহিমের কাছে। তিনিও ছিলেন আবুল হাসানের মতোই সমমানের দিব্যজ্ঞানসমৃদ্ধ। আবুল হাসান খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে বিখ্যাত করে তুলেন শাফেয়ী মতবাদের আইনজ্ঞ হিসেবে। তবে তাঁর গবেষণার মূল বিষয় ছিল ভেষজ বা ওষুধ বিজ্ঞান। শিক্ষা শেষ হবার পর তিনি হন নন্দিত চিকিৎসা বিজ্ঞানী।

এক সময় তিনি চলে যান কায়রোতে। সেখানে নিয়োগ পান নাসেরী হাসপাতালের প্রিন্সিপাল হিসেবে। সেখানে সুযোগ পান অসংখ্য চিকিৎসককে অনেক কিছু শেখাবার। তাঁর অনেক সুযোগ্য ও সুখ্যাত ছাত্র-শিক্ষক আত্মনিবেদিত ছিলেন মানবতার কল্যাণে। ইবনে আল-খুফ আল-মাসেহী তাঁদেরই একজন। তাঁর সময়ে মাসেহী ছিলেন বিখ্যাত ক'জন সার্জনের একজন। আবুল হাসান কায়রো'র মুনসুরিয়া স্কুল অব মেডিসিনেও পড়াতেন। তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমধিক আত্মনিবেদিত। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ, মারা যাবার আগে তিনি তার বাড়ি, লাইব্রেরি ও ক্লিনিক ঐ প্রতিষ্ঠানে দান করে যান। তিনি ইন্তেকাল করেন ৬৭৮ খৃস্টাব্দে।

ইতিহাসে এই আবুল হাসান বেশি পরিচিত ইবনে-আল-নাফিস নামে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি কাজ করেছেন দু'দিকে। একদিকে তিনি এ বিষয়টির অতীত বিশ্লেষণ করেছেন। বিষয়টির নানা শাখা-প্রশাখা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছেন। অন্যদিকে, তিনি আবিষ্কার করেছেন নতুন নতুন বিষয়। উন্মোচন করেছেন জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র। আলোকিত ও প্রসারিত করেছেন এ বিষয়ের জ্ঞান রাজ্যকে। মানুষের শরীরের রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার সত্যিকারের আবিষ্কারক হলেন ইবনে-আল-নাফিস। কিন্তু দুর্ভাগ্য, নানা কুচক্রী মহল তাঁর এ আবিষ্কারকে গোপন করে রাখে। এরা সে আবিষ্কারের কথা মানুষকে জানালো, যা ইবনে-আল নাফিস আবিষ্কার করেছিলেন তারো ৩০০ বছর আগে। রাষ্ট্রীয় শক্তি এভাবে সত্যের কবরে দাঁড়িয়ে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করায় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের সত্যি আপনা-আপনি একদিন প্রকাশ পায়ই। সেজন্যে, শেষ পর্যন্ত সত্যিই টিকে থাকে। সে সূত্রেই আজো এক্ষেত্রে ইবনে-আল-নাফিসের প্রাধান্য স্বীকৃত হচ্ছে।

মানবদেহ ছিল ইবনে-আল-নাফিসের কাছে এক অবাক বিস্ময়। তিনি ব্রতী ছিলেন এর রহস্য উদ্‌ঘাটনে। গভীরভাবে তিনি নিমগ্ন ছিলেন মানুষের শরীরের কাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার ব্যাপারে। তাঁর কঠোর শ্রম সাধনার ফলেই আমরা মানুষের ফুসফুসের সত্যিকার কাঠামো সম্পর্কে জানতে পাই। তিনি প্রথম অনুভব করেন, মানুষের শরীরের ভেতরে অব্যাহতভাবে চলছে রক্ত আর বায়ু প্রবাহ। তার কথা ছিল, এই রক্ত আর বায়ুপ্রবাহের ফলে অবশ্যই স্নায়ু ব্যবস্থায় এক ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। তিনি আসলে, এর মাধ্যমে আমাদের যথার্থ সত্যটিই জানান। তিনি প্রথম উপস্থাপন করেন ধমনী ব্যবস্থার সঠিক ব্যাখ্যা। এই ধমনী ব্যবস্থাই হৃৎপিণ্ডে রক্ত পৌঁছে দেয়।

ইবনে-আল-নাফিস ওষুধ বিজ্ঞানে নতুন দুয়ার খুলে দেন। তিনি লিখে গেছেন বেশ কিছু বই। তার সবচে' বিখ্যাত বইয়ের নাম : 'আল-শামিল ফি আল-তিব'। এই বইটি ছিল ৩০০ খণ্ডের। সবগুলো মিলে কার্যত সৃষ্টি হতো একটি বিশ্বকোষের। কিন্তু মৃত্যু হঠাৎ এসে তাকে ছিনিয়ে নিলো। ফলে সে স্বপ্ন আর সত্য হয়নি। বইটির পাণ্ডুলিপি এখনো দামেস্কে পাওয়া যায়। তিনি চক্ষুবিজ্ঞান নিয়ে লিখে গেছেন একটি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক বই। এতে প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর নিজস্ব গবেষণার বিষয়। সুখের কথা, বইটি এখনো পাওয়া যায়। তাঁর একটি বই 'মুজাজ-আল কানুন' আর সবগুলোকে ছাপিয়ে যায়। তাঁর আগের সময়ের দার্শনিকদের লেখা নিয়ে তিনি লিখেছেন বেশ ক'টি বই। এর মধ্যে রয়েছে হিপোক্রিটাসের কর্ম নিয়ে একটা বই। ইবনে-সিনার বিখ্যাত বই 'কানুন' নিয়ে তিনি লিখেছেন বেশ কিছু খণ্ডে একটি বই। এই বইটিও এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়। পুষ্টি সম্পর্কে রয়েছে তাঁর একটি আকর্ষণীয় বই। এই বইটির নাম : 'কিতাব আল-মুখতার ফি-আল-আখিদিয়া'। সে বইয়ে তিনি উপস্থাপন করেছেন একটি সুষম খাদ্য তালিকা। প্রথম পর্যায়ে তাঁর দুটি মাত্র বই লাতিন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। সে জন্যে তখনকার ইউরোপ তাঁর গবেষণা সম্পর্কে তেমন জানতো না। তখন দুনিয়া জুড়ে ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ আর প্রভাব। অতএব ইউরোপ যদি না জানে, তবে সব কিছুই ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর ফলে ইবনে-আল-নাফিসের অনেক কাজই কার্যত স্বীকৃত না হয়ে নর্দমায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এখন সময় এসেছে তাঁর অসাধারণ অবিষ্কারের স্বীকৃতি আদায় প্রশ্নে দাবি তোলার। এখন চূড়ান্ত সময় ইবনে-আল-নাফিসের পুনর্মূল্যায়নের।

ইবনে-বকর

এনেস্থেসিয়া পদ্ধতির আবিষ্কারক

ইবনে-বকর। একজন ওষুধ বিজ্ঞানী। উদ্ভাবক। আবিষ্কারক। এসব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব। সাধারণ অনুভূতিনাশক বা এনেস্থেসিয়ার প্রয়োগ পদ্ধতির সূচনা করেন এই প্রাজ্ঞজন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেছিলেন আফিম। তিনি একজন দার্শনিকও ছিলেন। অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী ইবনে-বকরের পুরো নাম : আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাজী। সম্ভবত তিনি জন্মেছিলেন ইরানের রাই নামের একটি স্থানে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে তাঁকে শুধু তুলনা করা চলে প্রতিভাপুরুষ আবু সিনা'র সাথে। ইবনে সিনা নামে যিনি সমধিক পরিচিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে-বকরের অবদান অনন্য ও অসাধারণ। তিনিই সর্বপ্রথম স্পষ্ট করে পার্থক্য

ধরিয়ে দেন স্মল পক্স ও চিকেন পক্স রোগের। অর্থাৎ গুটি বসন্ত আর জল বসন্ত যে এক রোগ নয়, সেটা প্রথম আমরা জানতে পারি ইবনে- বকরের কাছ থেকেই। শল্যচিকিৎসকরা মাঝে মধ্যেই পড়তেন এক হতবুদ্ধিকর অবস্থায়, তখন তিনি নিয়ে আসেন নামে এক নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থা। অনুভূতিবিলোপ বা এনেস্থেসিয়া নামে তা আজ সর্বত্র ব্যবহার হয়। অবশ্য প্রথম তিনি এ কাজে আফিমের ব্যবহার করেন। তিনি বেশ কিছু অ্যাসিডের সূত্রায়ন করেন। সালফিউরিক অ্যাসিড এগুলোরই একটি। তিনি সুষম অর্থাৎ ভারসাম্যপূর্ণ পথ্য তালিকা প্রণয়ন করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি যে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তাতে সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি আবির্ভূত হলেন ভেষজবিদ্যার ক্ষেত্রে একজন শীর্ষ সারির পণ্ডিতজন হিসেবে। তেমনি পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন গণিত, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শন বিষয়েও। তিনি সে সময়ের বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের কাছে শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন উল্লেখযোগ্য শিক্ষাবিদ হুনান ইবনে ইসহাক। গ্রীস, পারস্য ও ভারতে অর্জিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের রাজ্যে ইবনে-বকর গভীরভাবে বিচরণ করেন। আলী ইবনে রাব্বানের মতো শিক্ষকের ছাত্র হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন তিনি। আলী ইবনে রাব্বান ছিলেন সে সময়ের এক সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ।

আবু বকর কর্মজীবন শুরু করেন মুখতাদী হাসপাতালে। একজন ইন্টার্নি ডাক্তার হিসেবে সেখানে কাজ শুরু করেন। তিনি ইচ্ছেমতো সাফল্যের সাথে সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মদক্ষতার সুপ্রমাণিত নজির সৃষ্টি সূত্রে তিনি রাই-এর ইম্পেরিয়েল হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। সেখানেও তিনি অসাধারণ কর্মসফলতার প্রমাণ দেন। তাকে তখন আবার ফিরিয়ে আনা হয় বাগদাদের মুখতাদী হাসপাতালে। এবার তিনি এলেন হাসপাতালের প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে। হেকিম ডাক্তার হিসেবে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এশিয়ার সব জায়গা থেকে ছাত্ররা দলে দলে তাঁর কাছে পড়তে আসতে লাগলো। আবু বকরের ছাত্র হওয়াটা ছিল একটা সুযোগের ব্যাপার। তিনি সুদীর্ঘ সময় কাটান এই হাসপাতালে কাজ করে। তিনি জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণ করেছেন নানা দেশ। আবার জ্ঞান বিতরণের জন্যেও কখনো গিয়েছেন অন্য দেশে।

জীবনের শেষ দিকে তিনি চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে চারটি বই লিখে যান। বইগুলোর নাম : কিতাব আল-মুনসুরী, কিতাব আল-মুলকি, আল-হাবি এবং কিতাব আল-জুদারি ওয়া আল-হাসাবা। এই বইগুলো সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে। এখনো মূল্যবান বই হিসেবে বিবেচিত বই 'কিতাব আল-মুনসুরী' একটি বড় মাপের কাজ। পঞ্চদশ শতকে এই বইটি লাতিন ভাষায়

অনুবাদ করা হয়। দশ খন্ডের এই বইটিতে গ্রীক ও আরবীয় ওষুধ ব্যবস্থা ও থেরাপী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর কয়েকটি খন্ড অনান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। গুটি বসন্ত ও জলবসন্ত নিয়ে আলোচনা আছে বই 'কিতাব আল-জুদাবি ওয়া আল-হাসাবা'য়। গুটি বসন্ত তখন গোটা বিশ্বে ছিলো এক মহামারীবিশেষ। তিনি প্রমাণ করেন, এ রোগ দুটি এক নয়। এগুলোর জন্যে প্রয়োজন আলাদা আলাদা চিকিৎসা।

আবু বকরের অবদান ছিল বিস্ময়কর। তার কর্মসাফল্য সূত্রে এশিয়া ও ইউরোপের মানুষেরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। তার পরেও একজন হেকিম বা ডাক্তারের মধ্যে সীমাবদ্ধতা ছিল।

এখন হেকিম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা, এঁরা হচ্ছেন, হালুয়ার প্রস্তুতকারক। আর এরা বড় জোর স্বদেশী লতাপাতার বড়ি তৈরি করতেই পারেন। কিন্তু এক সময় হেকিম বলতে বুঝাতো 'ডাক্তারদের ডাক্তার'-'ডক্টর অব ডক্টরস'। ইউরোপীয় ভাষা এই অর্থটুকুর মধ্যে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে।

একটি কর্মসফল কর্মজীবন শেষে আবু বকর ফিরে যান নিজের জন্মস্থানে। তিনি সেখানেই মারা যান ৯০০ খৃষ্টাব্দে। সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।
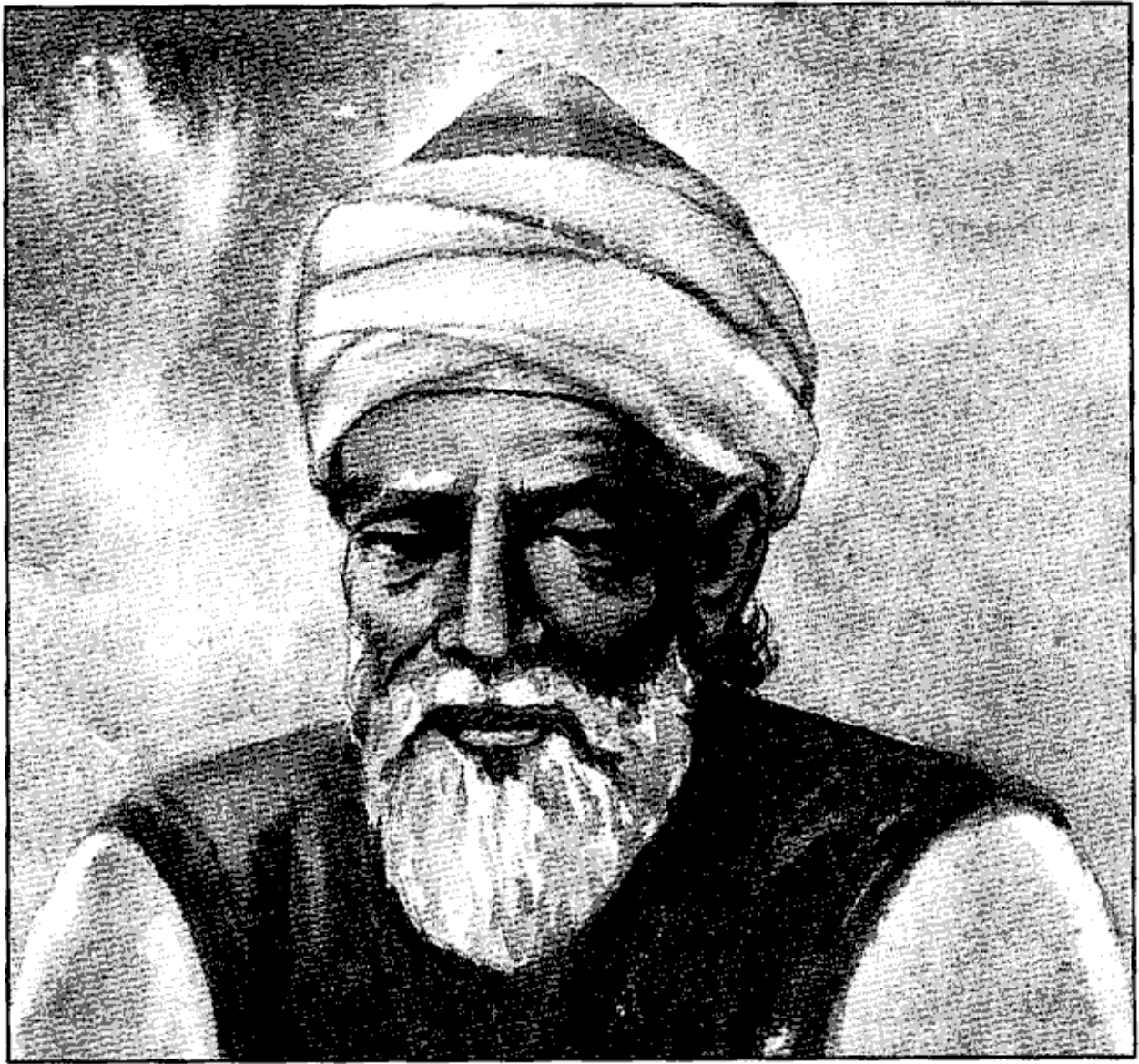
আবুল-ওয়াফা

ত্রিকোণোমিতির মূল স্থপতি

বাগদাদ। অনন্য এক নগরী। এক সময়ে পড়াশুনা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের বিশ্ব রাজধানী বলে ছিল এর চরম খ্যাতি ছিল। এক সময় হালাকুখান বাগদাদ আক্রমণ করে ঐতিহ্যবাহী বাগদাদ নগরীকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করেন। হালাকুখান বাগদাদ দখল করেন ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে। বাগদাদের লুণ্ঠনযজ্ঞে নেতৃত্ব দেন হালাকু খান নিজে। সে সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি বাগদাদ নগরীতে ঢুকে হালাকু খান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান দুমড়ে-মুচড়ে দেন। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, সে সময় বাগদাদে বিপুল সংখ্যক পুষ্প্রাপ্য বই ধ্বংস হয়। তার পরেও হালাকু খান ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রজ্ঞার একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন মহান জ্যোতির্বিদ উদ্ভাবক

নাসির উদ্দিন আল-তুশি। যিনি উদ্ভাবন করে গেছেন গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উপাত্ত বা টেবল 'জিজ-ইলখানি'।

যাই হোক, এই ঐতিহ্যবাহী বাগদাদ নগরীতে দশম শতাব্দীতে গণিতের বেশ কিছু নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। গণিত বিষয়ে নানা আবিষ্কার ছিল এসব অধ্যায়ে। ত্রিকোণোমিতি তার শৈশব কাটায় বাগদাদে এর চর্চা আর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। বলা হয়, বাগদাদ ছিল ত্রিকোণোমিতির দোলনা। আর সে দোলনায় ত্রিকোণোমিতির লালন পালনে ছিলেন যে প্রজ্ঞাবান মেধাবী পুরুষ তিনি কে? তিনি আর কেউ নন। তিনি আবুল ওয়াফা মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে ইসমাইল আল-বুজ্জানি। তাঁর অর্জন ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আবুল ওয়াফার জন্ম ৯৪০ খৃষ্টাব্দে। নিশাপুরের রুজ্জানি নামের এক জায়গায়।

আবুল ওয়াফার গবেষণার কেন্দ্রভূমি ছিল বাগদাদ। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি চলে যান বাগদাদে। সর্বোচ্চ মাত্রার শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন আবুল ওয়াফা। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গভীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের সৃষ্টি করে। তাঁর কাছ থেকে আমরা যেসব মূল্যবান ও অনন্য-সাধারণ অবদান পেয়েছি, সেগুলোর বেশির ভাগই ত্রিকোণোমিতি ও জ্যামিতি বিষয়ক। তিনিই ত্রিকোণোমিতির মূল স্থপতি। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান অমূল্য। জ্যামিতিতে কম্পাস ব্যবহারের কৃতিত্ব তাঁর। এই একটি উদ্ভাবন নানা সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। একটি বর্গের সমান আরেকটি বর্গ কীভাবে আঁকতে হয়, তিনিই প্রথম তা আমাদের জানান। তিনিই প্রথম আকার দেন অধিবৃত্ত বা প্যারাবোলারা। বহুতলা বা পলিহাইড্রা তিনিই প্রথম তৈরি করে দেন। হেক্টাগনও তাঁরই সৃষ্টি। তিনি তৈরি করেন অভাবনীয় জ্যামিতিক সমীকরণ। এর সমাধানও দেন তিনি নিজে।

আবুল ওয়াফা উদ্ভাবন করেন সাইন থিওরেম। সাইন টেবল তাঁরই তৈরি করা। ট্যাঞ্জেন্টে বা স্পর্শক এবং স্পর্শক সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞানার্জন করেন। এক্ষেত্রে তাঁর অধ্যাবসায় বৃথা যায়নি। গণিতবিদ্যার 'ট্যাঞ্জেন্ট টেবল' আমরা পেয়েছি আবুল ওয়াফার কাছ থেকে। জ্যামিতির নানা শাখা প্রশাখার সত্যিকারের উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক ছিলেন তিনি। কোণিক জ্যামিতি বা কোনিক্যাল জিওম্যাট্রির বিভিন্ন বিষয়ে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। তিনি একজন শীর্ষসারির জ্যোতির্বিদও ছিলেন। তিনি উদ্ভাবন করেন 'প্রিন্সিপল্ অব ভ্যারিয়েশন্স'। চাঁদের বিভিন্ন গতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন তিনি।

ছিলেন বড় মাপের এক লেখক। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন, যারা প্রাচীন গ্রীসের বিজ্ঞানীদের জানিয়েছিলেন নানা মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য। তাঁর অনেক বই-ই আজ হারিয়ে গেছে সময়ের অতল গ্রাসে। কিছু কিছু বই আছে

বিকৃত অবস্থায়। মৌলিক অবস্থায় সেগুলো পাওয়া কঠিন। তার সবচে' মূল্যবান বইটির বিষয় গণিত। বইটির নাম: 'কিতাব লিম আল-হিসাব'। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত বই : 'কিতাব আল হান্দসা'। প্রথমটি তাঁর নানা লেখার একটি সঙ্কলন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভৌত জ্যামিতি বিষয়ে একটি খাঁটি বই। ইউক্লিড, ডিওফেন্টস ও আল-কাওয়ারিজমী সম্পর্কে তিনি মূল্যবান বিশ্লেষণ রেখে গেছেন। তবে এগুলো আজ আর পাওয়া যায় না।

চাঁদ সম্পর্কিত তাঁর আবিষ্কার নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। কিন্তু সময়ের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর আবিষ্কার ছিল যথার্থ অর্থেই সঠিক। তাঁর আবিষ্কারের ৬০০ বছর পর। আমাদেরকে আবার আবিষ্কার করতে হচ্ছে তাঁর উদ্ভাবিত সত্যগুলো। ইতিহাস বিকৃতির পরও ত্রিকোণোমিতির সমৃদ্ধিতে তার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে। আজকের দিনের ত্রিকোণোমিতি বিষয়ক জ্ঞানী-গুণীরা এই মহান মানুষটির কাছে ঋণী। গণিত জগতের গণিতবিদেরা সম্মানের সাথে আজো স্মরণ করেন আবুল ওয়াফার নাম।

হেকিম হাবিবুর রহমান
ব্রিটিশের 'শেফা-উল-মুলক' খেতাব প্রত্যাখ্যানকারী

ঢাকার মাটিতে বসবাস করেও একজন বহুমুখী কর্মশক্তি ও প্রতিভাব অধিকারী চিকিৎসক ও দার্শনিক গৌরবের শীর্ষ শিখরে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন চিকিৎসক হিসেবে তিনি ছিলেন গভীরভাবে ইবনে সিনার অনুসারী। বোখারা'র কাছাকাছি আফসানায় জন্মগ্রহণকারী ইবনে সিনাহ ছিলেন তাঁর সময়ের সবচে' সুখ্যাত চিকিৎসক। ইবনে সিনা আমাদের বলে গেছেন, একজন ডাক্তারের পূর্ব-যোগ্যতা কী হবে। তিনি বলে গেছেন : 'একজন ডাক্তারকে অমায়িক, সহজ সরল এবং সাদাসিধে হতে হবে। দেয়ার এবং কল্যাণ সাধণের মন থাকতে হবে। চরিত্রের দিক থেকে তিনি হবে সর্বোত্তম চরিত্রের। উপলব্ধি করার মতো অনুভূতিপ্রবণ হতে হবে তাকে'। ঢাকার চিকিৎসক হেকিম হাবিবুর রহমান ইবনে সিনার অনুসারী হিসেবে নিজের মধ্যে এসব গুণাবলী

অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর পুরো নাম হেকিম হাবিবুর রহমান আখুনজাদা। তাঁকে যথার্থই বলা হতো : 'শেফা-উলক-মূলক' –'জগতের আরোগ্যকারী'।

হেকিম হাবিবুর রহমানের জন্ম ঢাকায়। ১৮৮১ সালের ২৩ মার্চ। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার উত্তরসূরী বলে তাঁর বংশধরগণ দাবি করেন। তাঁর পিতামহ পাকিস্তানের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বাবা মোহাম্মদ শাহ আলীগড়ে এসেছিলেন লেখাপড়ার জন্যে। পরবর্তী সময়ে তিনি দেওবন্দ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকার নওয়াব এস্টেটে চাকরি নিয়ে তিনি ঢাকা আসেন। শেষ পর্যন্ত ঢাকার ছোট কাটারায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

হেকিম হাবিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা নেন ঢাকায়। উচ্চ শিক্ষার জন্যে যান ভারতের কানপুরে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে। ভেষজ বিদ্যার ইসলামী শাখার নাম ইউনানী। এই ইউনানী চিকিৎসা বিদ্যা শেখার জন্যে তিনি যান লক্ষ্মৌ, দিল্লি ও আগ্রা। সেখানে ছিলেন হেকিম আব্দুল মজিদ খান, হেকিম আগা হাসান ও অন্যান্য আরো অনেক সুবিখ্যাত হেকিম। ১৯০৪ সালে তিনি ফিরে আসেন ঢাকায় একজন সম্পূর্ণ হেকিম হিসেবে। ওষুধ বিষয়ে পড়াশোনার সময়েই তিনি পরিণত হন একজন আধ্যাত্মিক পুরুষে। হেকিম হিসেবে হাবিবুর রহমান অল্প সময়েই রূপকথাতুল্য মাত্রা অর্জন করেন। রোগ নির্ণয়ে তিনি ষড়রিপুকে কাজে লাগাতেন। তাঁর চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট নানা কথা কাহিনী রূপকথার মতো ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এক পলক দেখেই মূত্র পরীক্ষা সমাধান করতে পারতেন। বিষয়টি এখনো প্যাথলজির অংশ। তখন মূত্র দেখে রোগ নির্ণয় বিষয়ে তাঁর দক্ষতা দেখে প্যাথলজিস্টরাও অবাক হয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল যথার্থ অর্থেই নির্ভুল। রেডিওতে রোগীর কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর চিকিৎসা করার ক্ষমতা ছিল অবাক করার মতো। এ থেকে চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতার মাত্রা কিছুটা আঁচ করা যায়। কিডনির পাথর সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎসা তিনি যেভাবে করতেন, তা ইংরেজ কমিশনার মি. লারকিনকে আকৃষ্ট করেছিল। এই বিস্ময়কর চিকিৎসক লারকিনের কিডনির পাথর সংশ্লিষ্ট জটিল রোগ নিরাময় করেন। স্থানীয় ফলমূল দিয়ে ভিটামিনের অভাব পূরণের পক্ষপাতী ছিলেন হাবিবুর রহমান। ১৯৩৯সালে বৃটিশ সরকার তাঁর মেধার প্রতি স্বীকৃতি জানায়। আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে দেখা হয় 'শেফা-উল-মূলক' উপাধি। কিন্তু ন্যায়-নীতির ধারক-বাহক হেকিম হাবিবুর রহমান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

হেকিম হাবিবুর রহমান একজন উল্লেখযোগ্য মানের লেখকও ছিলেন। ছিলেন ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক। তিনি কিছু বইও লিখে গেছেন। তিনি প্রাচীন যুগের নিদর্শন সংগ্রাহকও ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল 'আল-ফারিক'। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটি একটি মূল্যবান বই। তাঁর আরো কিছু বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে আছে : আসুদগান-ই-ঢাকা, শু আরা-ই-ঢাকা, সালাসা গাস সালা, কুচ পুরান বাতে, হায়াত-ই-সুক্রাত (সক্রেটিস)। তিনি ঢাকায় একটি ইউনানী কলেজ গড়ে তুলেন, যাকে বলা হয় তিব্বিয়া কলেজ। হেকিম হাবিবুর রহমান রোডের একটি বাড়িতে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে এর যাত্রা শুরু হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি চালু হয় মাত্র ৮ জন ছাত্র নিয়ে। এখন এটি ঢাকার একটি বিকাশমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

তিনি 'জাদু' নামে একটি উচুমানের উর্দু জার্নাল প্রকাশ শুরু করেন ১৯২৩ সালে। অন্যটি ছিল 'মাশারিখ'। তিনি নিজে ছিলেন এর সম্পাদক। তিনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সেবক। ১৯০৮ সালে তিনি নির্বাচিত হন আসাম-বেঙ্গল মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সদস্যও হয়েছিলেন। ছিলেন ঢাকা মিউনিসিপালিটির আজীবন সদস্য। ১৯৪২ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একটি লঙ্গরখানা পরিচালনা করেন। এই বহুমুখী কর্মী পুরুষের জীবনাবসান ঘটে ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। স্বাধীন পাকিস্তান গঠনের মাত্র কয়েকমাস আগে। আজিমপুর দায়রা শরীফে তাকে দাফন করা হয়।

আব্দুস সালাম
নোবেল বিজয়ী এক বিজ্ঞানী

মধ্যযুগের জ্ঞান বিজ্ঞান ইসলামের স্বর্ণোজ্জল অধ্যায়। পরবর্তী সময়ে মুসলমানেরা জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাফল্য সেভাবে আর ধরে রাখতে পারেনি। ফলে মধ্যযুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে আধুনিক যুগের মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানীদের ও দীর্ঘদিনের স্থায়ী বিচ্ছিন্নতা গড়ে ওঠে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে সে বিচ্ছিন্নতা ভাঙলেন পণ্ডিতবর মুসলিম বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুল সালাম। মেধার দৌড়ে তিনি হলেন এক সফল মেধাবী। হলেন নোবেল বিজয় করার মতো যথাযগ্যে বিজ্ঞানী। তাছাড়া তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের গতিশীল এক নেতা হিসেবে। আধুনিক সময়ের বিজ্ঞানী অধ্যাপক আব্দুস সালাম ছিলেন আধুনিক সময়ের বিজ্ঞান গবেষণার অনন্য নজির। সেই সাথে তিনি মনে প্রাণে ছিলেন একজন মুসলমান। তিনি ইসলামের সব রীতি-নীতি

মেনে চলতে চেষ্টা করতেন। বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যেকার যে ভাসা ভাসা দ্বন্দ আজ সমাজে বিদ্যমান, তারই অবসান ঘটাতে তিনি বরাবর সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এটুকু প্রতিষ্ঠা করে গেছেন : ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। তার প্রবল বিশ্বাস ছিল ইসলামী প্রজ্ঞার দোলনায় চড়ে বিজ্ঞানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা।

হাজেরা বেগম ও মোহাম্মদ হোসেইন ছিলেন অধ্যাপক সালামের মা-বাবা। তিনি ছিলেন মা-বাবার সাত সন্তানের মধ্যে প্রথম। অধ্যাপক সালামের জন্ম ১৯২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের জং এ তাঁর জন্ম। বাবা মোহাম্মদ হোসেইন ছিলেন একজন শিক্ষক। আব্দুস সালাম চেয়েছিলেন একজন সরকারি চাকুরে হবেন। সোজা কথায় যোগ দেবেন সিভিল সার্ভিসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তার সময়ে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়। তিনি চলে গেলেন ক্যামব্রিজে। উদ্দেশ্য আরও পড়াশোনা করবেন। তাঁর জীবনে এলো নতুন মোড়। ক্যামব্রিজে থাকার সময় তিনি 'মিশন থিওরী' স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে গাণিতিক অসামঞ্জস্য দূর করার উদ্যোগ নেন। পাঁচ মাসে তিনি সে সাফল্য পান। এদিকে তাঁর ডক্টরাল তত্ত্বালোচনা ইতোমধ্যেই সমাপ্ত। কিন্তু রেগুলেশনের কারণে তা ১৯৫২ সালের আগে জমা দিতে পারেননি। আব্দুস সালাম পাকিস্তানে ফিরে আসেন ১৯৫১ সালে। নিয়োগ পান পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান হিসেবে।

তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ফিরে যেতে চাইলে বুদ্ধিভিত্তিক মূলধারায়। ১৯৫৪ সাল ফিরে যান ক্যামব্রিজে। সেখানে পেশাজীবী একটি পদে নিয়োগ পান। তাঁর জন্যে খুলে যায় বিজ্ঞান জগতের উজ্জ্বল পথ।

তিনি জীবনে অনেক পুরষ্কার আর সম্মাননা পেয়েছেন। ১৯৬৮ সাল পান 'এটমস ফর পীস এওয়ার্ড'। ১৯৭৮ সালে লন্ডনের রয়েল সোসাইটির 'রয়েল মেডেল'। ১৯৮৩ সালে তৎসময়ের ইউএসএসআর বিজ্ঞান একাডেমী থেকে 'লোজোনোসভ স্বর্ণ পদক'। এর বাইরেও রয়েছে আরো পুরস্কার ও সম্মাননা। এতোসব পুরস্কার আর সম্মাননা পেয়ে তিনি উৎফুল্ল হয়ে ওঠেননি। তিনি কাজ করে চলেন নীরবে। চারপাশে তার নৈঃশব্দ। ২৫০ টির মতো প্রবন্ধ লিখে গেছেন বিভিন্ন বিষয়ে। তার উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম : "Symmetry Concepts in Modurn Physics'.

অধ্যাপক সালাম নোবেল পান ১৯৭৯ সালে। ইলিমেন্টারী পার্টিক্যালস-এর ওপর তাঁর যাবতীয় মৌল গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁকে নোবেল দেয়া হয়। এর মাধ্যমে মুসলিম বিজ্ঞান মানস আবারও ঝলমলিয়ে উঠলো। তার গবেষণার প্রিয় বিষয়: Grand Unification of Forces'.

প্রফেসর আব্দুস সালাম ছিলেন ইতালির ত্রিয়েস্টে গড়ে তোলা 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল পিজিক্স'-এর পরিচালক। ১৯৬৪ সালে এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা পায়। ত্রিয়েস্ট হচ্ছে ইতালির বিজ্ঞান নগরী। তাঁর নেতৃত্বে সেখানে বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে পদার্থ বিজ্ঞানকে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন দর্শনের সমপর্যায়ের মর্যাদায়। সেখানে পল মেথিউস-এর মতো আধুনিক সময়ের অনেক নামকরা পদার্থবিদ ছিলেন তার সহকর্মী।

উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞান উন্নয়নে অধ্যাপক সালামের ছিল গভীর আগ্রহ। এসব দেশে বিজ্ঞান গবেষণার বদলে শাসকেরা বেশি ব্যস্ত প্রযুক্তি চালু করার ব্যাপারে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন অধ্যাপক সালাম। তার জোরালো অভিমত, ভাল বিজ্ঞান ছাড়া যথাযথ প্রযুক্তি কাজে লাগানো অসম্ভব। তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞান উন্নয়ন ছাড়া প্রযুক্তি সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি আসবে না। মৌল গবেষণা ছাড়া প্রযুক্তি সৃষ্টি হয় না।

বিজ্ঞানী সালাম ঢাকায় এসেছিলেন ১৯৮৬ সালের ৮ জানুয়ারি। তিনি তাঁর ঢাকা সফরের সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সফরসহ বিজ্ঞানীদের সাথে মত বিনিময় করেন। এ সময় তিনি তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞানের মৌল গবেষণার প্রতি তাগিদ দেন।

জনাব সালাম বিয়ে করেন আমাতুল হাফিজ বেগমকে। তাঁদের একমাত্র কন্যা রয়েছে।

এফ. আর. খান
বিশ্বের সবচে' উঁচু ভবনের নকশাবিদ স্থপতি

বাংলাদেশ। আমাদের প্রিয় দেশ। প্রাণের দেশ। দেশটি এখনও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর তালিকায়। এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও, এক সময় এ দেশের ওপর চলে দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ। ইংরেজদের শাসন আর কৌশলী শোষণ দেশটির ভাবমূর্তিকে বরাবর খর্ব করে রেখেছে। তার পরেও এদেশের অনেক কৃতি সন্তান তাদের কর্ম সাধনার সাফল্য দিয়ে দেশের মর্যাদাকে অনেক অনেক ওপরে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এঁরা আমাদের দেশের গর্বের ধন। এদেরই একজন ফজলুর রহমান খান। এফ. আর. খান নামেই যিনি বেশি পরিচিত। বিশ্বখ্যাত স্থপতি এফ. আর খান নকশা তৈরি ও নির্মাণ করেছেন পৃথিবীর সবচে' উঁচু ভবনের। সারা বিশ্ব যখন বিশ্বের সবচে' উঁচু আকাশচুম্বী এ

ভবনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তখন মনে হয় তারা যেনো বাংলাদেশের জন্যে এফ. আর খানের তৈরি মিনারই দেখছে।

বিশ শতকের সেরা এই স্থপতির জন্ম বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলার ভাণ্ডারী কান্দি গ্রামে। বাবা আব্দুর রহমান খানও ছিলেন একজন গণিতবিদ। বাংলাদেশের এই ওয়ান্ডার-ম্যান এফ. আর. খান মাটির পৃথিবী ছেড়ে চলে যান ১৯৮২ সালে।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক হন। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্যে যান যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে ইলিনয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা কাঠামো সংক্রান্ত প্রকৌশলে। এ বিষয়টিকে আমরা স্থাপত্য প্রকৌশল বলে জানি। এরপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন তাত্ত্বিক ও ফলিত যন্ত্রকৌশল বিষয়ে। তিনি ডক্টরেট করেন কাঠামো প্রকৌশল বিষয় নিয়ে। অসাধারণ মেধাবী এফ. আর. খান কাঠামো প্রকৌশল বিষয়ে এক বৈপ্লবিক দিগন্তের সূচনা করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অন্যন্য আর সবার উপলব্ধির সীমাকেও ছাড়িয়ে যায়। তিনি প্রকৌশল ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বে সবচে' বড় মাপের অবদান রেখে গেছেন। এফ. আর. খান যেনো সৃষ্টিকর্তার এক দৈব-দান।

তাঁরই দেয়া নকশায় তৈরি হয়েছে চিকাগোর সিয়ারস টাওয়ার। ১১০ তলা এই টাওয়ার ১৪৫৪ ফুট উঁচু। এটি বিশ্বের সবচে' উঁচু মাল্টি-পারপাস বিল্ডিং। অর্থাৎ এই ভবনটি বহু কাজে ব্যবহার করা হয়। এর বাইরেও তিনি তাঁর নিজস্ব মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে আরও অনেক বড় বড় ভবনের নকশা প্রণয়ন করে গেছেন। ইস্পাত ও পাথরের নবতর কাঠামো ব্যবস্থার সাহায্যে তিনি এসব ভবনের নকশা ও নির্মাণ কাজ সম্পাদন করেন। তিনি তাঁর সৃজনশীল প্রকৌশল কর্মের মধ্য দিয়ে তৈরি করে দিয়ে গেছেন প্রকৌশলের এক নয়া জগত।

ফজলুর রহমান খান একদিকে ছিলেন শিক্ষক, অপরদিকে ছিলেন বার্তাবাহক। তিনি তাঁর ছাত্রদের মাঝে পৌঁছে দিয়ে গেছেন প্রকৌশলের যতোসব নয়া বার্তা। তাঁর কাছে তাঁর ছাত্ররা ছিলো ভবিষ্যতের আলো : 'দি লাইট অব দ্যা ফিউচার'। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অর্জনকে শিক্ষকতায় ব্যবহার করতে পেরে আনন্দিত হতেন। আকাশচুমী ভবন সম্পর্কিত তাঁর জ্ঞান আর প্রজ্ঞা কালজয়ী বলে বিবেচিত। স্থাপত্য সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণায় রয়েছে দার্শনিক মাত্রা। এই দর্শন মানব সমাজের জন্যে এক গর্ব-গাঁথা। এই গর্ব-গাঁথা তাঁর তৈরি সুউচ্চ ভবনের মতোই অনেক অনেক উঁচু। আশা করা যায়, এই গর্ব-গাঁথা কালোত্তীর্ণ হবে।

ফজলুর রহমান খান তাঁর পেশার মান আর অবস্থান উন্নয়নে রীতিমতো ছিলেন ঈর্ষাপরায়ণ। তিনি স্থাপত্য ও প্রকৌশল বিষয়ে কমপক্ষে ৭৫টি লেখা প্রকাশ করে গেছেন। লেখা গুলো সত্যিই অমূল্য। এগুলো আধুনিক সভ্যতার জ্ঞান ভাণ্ডার। তিনি ছিলেন চিকাগোর 'ইলিনয়ে ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'র এডজাঙ্কট প্রফেসর। বাংলায় যাকে বলা যায়, আনুষঙ্গিক অধ্যাপক। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সে দায়িত্ব পালন করেন। সেই সাথে আমৃত্যু তিনি ছিলেন 'কাউন্সিল অব টল বিল্ডিং'-এর চেয়ারমান। তাকে 'বিশ্বের সেরা কাঠামো প্রকৌশলী' সম্মানে ভূষিত করা হয়। যদ্দিন জ্ঞান-গাঁথা অস্তিত্বশীল থাকবে, তদ্দিন তিনি থাকবেন টলেস্ট অব দ্যা টল ম্যান। অর্থাৎ তিনি থাকবেন সেরাদের সেরা। আমরা বাংলাদেশীরা সবাই তাঁর গর্বে গর্বিত।

আবু মারওয়ান
পরভূক জীবাণু বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা

আমরা অনেকেই জানিনা, বড় মাপের একজন মুসলিম বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে 'প্যারাসাইটোলজী'-কে চিহ্নিত করেছিলেন। প্যারাসাইটোলজি'র বাংলা নাম দেয়া যায় পরভূক জীবাণু বিজ্ঞান। এ বিষয়টিকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের মর্যাদায় সমাসীন করেছিলেন বিজ্ঞানী আবু মারওয়ান আব্দুল মালিক ইবনে জহুর। একমাত্র তিনিই এই কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। তাকে ইহুদী বলে চিহ্নিত করার জন্যে একটা অহেতুক বিতর্ক বিভিন্ন মহল থেকে তোলা হয়েছিল। সুখের কথা, এই অকার্যকর বিতর্কের স্বাভাবিক অবসান ঘটে শেষ পর্যন্ত। এক সময় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এলো, আবু মারওয়ান ছিলেন এক সহজ সরল মুসলমান। তবে তিনি ছিলেন প্রতিভাধর এক বিজ্ঞানী। তিনি জন্মেছিলেন স্পেনের সিভেল্লীতে। ১০৯৪ সালে।

আবু মারওয়ানের সমসাময়িক পণ্ডিতজনেরা প্রয়াস চালাতেন যথাসম্ভব বেশি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের। কিন্তু তিনি ছিলেন এ ধারণার বিপক্ষে। তিনি শুধু একটি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সারা জীবন আত্মনিবেদিত ছিলেন চিকিসা বিজ্ঞান নিয়ে। লেখাপড়া শেষ করে চাকরি নেন শাসক আল-মুরায়িদ (আল মুরাবাতুন)-এর অধীনে। তিনি ছিলেন একজন আল-মুহাদ্দিস (আল-মুহাদুম) শাসক। মারওয়ান কাজ করেন আব্দুল মমিনের অধীনে।

আল-মুরায়িদের এবং আল-মুহাদ্দিসদের রয়েছে আলাদা নিজস্ব ইতিহাস। স্পেনে মুসলিম শাসনের পতন সময়ে পশ্চিম আফ্রিকায় উত্থান ঘটে এক নতুন শক্তির। সাহারার আশেপাশে বসবাস করতো একটি নাপিত সমাজ। এরা পরিচিত ছিল মুসাসামিনস নামে। এরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। তাঁদের ধর্মীয় নেতা 'মরবুত' নামে পরিচিত ছিল। মরবুতদের রাজাকে বলা হতো 'আল-মারাবিতা' কিংবা 'আল-মুরাবিদ'। তাদের মধ্যে সবচে' বিখ্যাত ছিলেন মোহাম্মদ ইবনে তুমুর্ত। তাঁর অনুসারীরা তাঁকে মহান সাধুপুরুষ হিসেবে বিবেচনা করতো। তিনি 'মেহদি' উপাধি ধারণ করেন। তিনি ধর্ম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অনুসারীরা পরিচিত ছিল 'আল-মুয়াহেদিন' নামে। খুব শিগগিরই এরা রূপকথাতুল্য ধন সম্পদের অধিকারী হলো। হয়ে উঠলো অনন্য শক্তিধর। গড়ে তুললো এক সাম্রাজ্য। ইবনে তুমুর্ত আব্দুল মমিনকে তাঁর কমরেড হিসেবে গ্রহণ করলেন। মমিন ছিলেন খুব বড় এক ধনী ঘরের সন্তান। ৫২৬ হিজরি সনে অর্থাৎ ১১৩০ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন তুমুর্ত। আল-মুহাদ্দিসের শাসক হলেন আব্দুল মমিন। এ বংশের তিনি হলেন প্রথম শাসক।

মুসলমানদের সেই স্বর্ণ যুগে আবু-মারওয়ান ছিলেন এক বিখ্যাত চিকিৎসক। ছিলেন একজন সুবিখ্যাত আবিষ্কারকও। তিনি সে সময়ে অনেক নতুন নতুন ধরণার জন্ম দেন। চামড়ার স্ফোটকা কেন হয়, কেন হয় চুলকানি ইত্যাদির প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন তিনি। এক্ষেত্রে তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো পরভূক জীবাণুর আক্রমণে চামড়ায় স্ফোটকা হয়, চুলকানি হয়। তিনি আবিষ্কার করেন প্যারাসাইট বা পরভূক জীবাণু। বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞার ইতিহাসে মারওয়ানই ছিলেন প্রথম প্যারসাইটোলজিষ্ট। বাংলায় বলা যায়, পরভূক জীবাণুবিদ। এই মহান চিকিৎসক শ্বাসনালীতে শল্যচিকিৎসার সূচনা করেন। তিনি হচ্ছেন সেই প্রতিভাধর, যিনি সর্বপ্রথম অন্ননালী দিয়ে কৃত্রিম খাবার গ্রহণের সূচনা করেন। সে সময়ে এটা ছিল একটা বৈপ্লবিক ব্যবস্থা। তিনিই প্রথম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন মেডিস্টিনাল টিউমারের। এ ছাড়া দেহের ভেতরের যক্ষ্মা ও ফোড়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও সর্বপ্রথম তাঁর কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি। কানের ভেতরের ফোড়ার কারণও তিনি বিশ্ববাসীকে প্রথম জানান।

আবু মারওয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানের বেশ কিছু বই লিখে গেছেন। সময়ের স্রোতে তাঁর অন্তত তিনটি বই আজও টিকে আছে। আধুনিক সার্জারীর জনক আবু রুশদে-এর মতে, মারওয়ান-এর 'কিতাব আল-তাইমির ফি-আল-মুদায়াত ওয়া-আল-তদবির' বইটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁর বইয়ে ওষুধ এবং পথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে গেছেন। তাঁর কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করেছেন তাঁর বইয়ে। তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই : 'কিতাব আল-ইফতিসাদ ফি-ইমলাহ আল-আনফুস ওয়া আল-আজসাদ'। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মনস্তত্ত্ব। এর পরের খণ্ডের আলোচনা রোগ সম্পর্কে। রোগের আলোচনা করে ওষুধও বাতলে দেয়া হয়েছে এ বইয়ে। এতে উপদেশ আছে স্বাস্থ্য ও পথ্য বিষয়ে। সে সময়ের চিকিৎসকেরা এই বইটির মাধ্যমে বেশ উপকার পেয়েছেন। তার আরেকটি বইয়ের নাম : 'কিতাব আল-আখজেন'। বইটি তথ্য বিষয় নিয়ে লেখা। এটি একটি অনন্য সাধারণ বই। স্বাস্থ্য ও পথ্যের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান-তাই এই বইটিতে তুলে ধরা হয়। লেখকের জ্ঞানান্বেষণ ও ব্যাখ্যা দেবার ক্ষমতা আজকের দিনেও বিরল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আবু মারওয়ানের অবদান পরবর্তী প্রজন্মেও প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো হিব্রু ও লাতিন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। আঠারো শতকেও এসব বই খুব সুনামের সাথে ইউরোপে পড়া হতো। যখন রাষ্ট্রক্ষমতা হারিয়ে যায়, তখন প্রজার স্বীকৃতিও হারিয়ে যায়। মারওয়ানের গভীরতর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাঁর অসাধারণ পদ্ধতি নিয়ে আজ আর কেউ ভাবে না। তিনি যখন গৌরবের শীর্ষ শিখরে, ঠিক তখনই তিনি এই মাটির পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে তার জন্মস্থান সেভেল্লিতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। সেই সাথে গোটা মানবজাতি হারায় একজন অনন্য বিজ্ঞানী ব্যক্তিত্বকে।

ইবনে আল-বাইতার

২০০ ঔষধি গাছের আবিষ্কারক

ত্রয়োদশ শতক। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জন্যে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির শতক বলে এটি পরিচিত। উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ে এ শতকে ব্যাপক আবিষ্কার-উদ্ভাবন সাধিত হয়। এক মহান একক ব্যক্তিত্ব এ সময়ে ২০০'রও বেশি ঔষধি গাছ আবিষ্কার করেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ১৪০০ ঔষধি গাছ ও লতাপাতা নিয়ে। এগুলো নিয়ে চলে তাঁর নানা গবেষণা। ঔষধি গাছ হচ্ছে সেইসব গাছ, যেগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রোগের ওষুধ তৈরি করা যায়।

মহান এ গবেষক ব্যক্তিত্ব এই বিপুল পরিমাণ ঔষধি গাছ ও লতাপাতা নিয়ে যে মূল্যবান গবেষণা করে গেছেন, উন্মোচন করে গেছেন নানা অজানা তথ্য, তার বিবরণ তুলে ধরেছেন তাঁর একটি বইয়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর এ বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই। এই সুখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর নাম আবু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে

আহমেদ ইবনে আল-বাইতার জিয়াউদ্দিন আল-মালাকি। তাঁর জন্ম স্পেনের মালাকা বা মালাগা নামের একটি জায়গায়।

তিনি তাঁর উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ শুরু করেন একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর কাছে। তাঁর এ শিক্ষক-বিজ্ঞানীর নাম আবুল আব্বাস আল-নাবাতি। তিনি তাঁর শিক্ষকের সাথে বেরিয়ে পড়তেন ঔষধি গাছ সংগ্রহের কাজে। ১২১৯ সালের দিকে তাঁরা তাঁদের এই অভিযান পরিচালনা করেন। ঔষধি গাছ সংগ্রহের জন্যে এঁরা স্পেনের পাশের দেশগুলোতেও যান। এমনকি এঁরা এশিয়া মাইনর অঞ্চলেও যান। সোজা কথায়, এঁরা দু'জন ঔষধি গাছ খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেরিয়েছেন পৃথিবীর নানা জায়গায়। কৃষ্ণ সাগর আর উত্তর ভূমধ্যসাগরের মাঝের অঞ্চলীয়। এরপর এঁরা আর উত্তর ভূমধ্যসাগরের মাঝের অঞ্চলীয়। এরপর এঁরা গেছেন আফ্রিকার উত্তর উপকূলে। এঁরা গুরুত্বপূর্ণ যেসব জায়গায় এ কাজে গেছেন, সেগুলোর মধ্যে আছে : বুগিয়া, কান্তানতুনিয়া বা কনস্টান্টিনোপল, তিউনিস, ত্রিপোলি, বুরকা ও আদালিয়া।

এলো ১২২৪ খৃষ্টাব্দ। এ সময় আল-বাইতার চাকরি পেলেন মিসরীয় গভর্ণর আল-কামিলের অধীনে। তাঁকে সেখানে নিয়োগ দেয়া হয় প্রধান উদ্ভিদবিদ বা চীপ বুটানিস্ট হিসেবে। আল-কামিল নিজেকে দামেস্কে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২২৭ খৃষ্টাব্দের দিকে আল-কামিল আল-বাইতারকে নিয়ে গেলেন দামেস্কে। আবিষ্কার অভিযানের জন্যে এভাবে সিরিয়া বাইতারের জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠলো। তিনি এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগান। আরব আর ফিলিস্তিনের পাহাড়ী এলাকায় তিনি তার 'সংগ্রহ অভিযান' সম্পাদন করেন। এর মাধ্যমে তিনি ঔষধি গাছ সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটান। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বিশ্বব্যাপী আল-বাইতারের গবেষণা-কর্ম অনুসরণ করেন।

তার গবেষণা-কর্মকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে আছে তাঁর পূর্বসূরীদের আবিষ্কার উদ্ভাবন নিয়ে চর্চা। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে তাঁর নিজস্ব গবেষণা ও আবিষ্কারের ওপর আলোকপাত। আল-বাইতারের লেখা বই 'কিতাব-আল-জঈন ফিল-আদাবিয়াল মুফরাদা' হচ্ছে জ্ঞানের এক স্বর্ণখনি। বইটি আরবী ভাষায় লেখা। এই বইটিকে বলা যায় একটি বিশ্ব কোষ। এই বইটির বিভিন্ন বিষয়ে ১৪০০'র মতো লেখা রয়েছে। বেশির ভাগ লেখাই ঔষধি গাছ সম্পর্কে এবং শাক-শজি আর লতাপাতা সম্পর্কে। আগেই বলা হয়েছে, তিনি ব্যাপক গবেষণা করে ২০০ ঔষধি গাছ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর লেখা আরেকটি বইয়ের নাম 'জামি'। এই বইয়ের মাধ্যমে প্রবেশ ঘটানো হয়েছে অতীতের ১৫০ আরব লেখকদের জগতে। এতে ২০ জন গ্রীক বিজ্ঞানীর কর্মকাণ্ড নিয়েও আলোচনা আছে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে এই বইটির অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। জামি

পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে কিছুটা পরে। কিন্তু পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবরেরা বইটি আরবী ভাষায় পড়ে নেন। তাঁদের লিখিত বইয়ে 'জামি'র নানা উল্লেখ রয়েছে।

আল-বাইতার ছিলেন একজন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানী। যাকে বলা যায়, আপাদমস্তক বিজ্ঞানী। তাঁর ছিল গভীরতম দৃষ্টিভঙ্গি। সেই সাথে তাঁর ছিল একটা যৌক্তিক মন। তিনি তাঁর সমস্ত গবেষণা কর্মকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে গ্রথিত করেছিলেন। এসব কিছু মিলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের পছন্দের মানুষ। তাঁরা কথায় কথায় উদাহরণ টানতেন আল-বাইতারের। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাঁর কর্মকাণ্ড সহজেই গ্রহণযোগ্যতা পায়। প্রতিষ্ঠা পায় একটা ভিত্তি হিসেবে।

বাইতারের পরবর্তী বইটি লেখা ঔষুধ বিষয়ে। এটা প্রায় একটা বিশ্বকোষের মতো। বইটির নাম : 'কিতাব-আল মুঘিন ফিল-আদ্রিয়েল মুফারদা'। এর রয়েছে বিশটি অধ্যায়। মগজ, কান, চক্ষু ইত্যাদি এর আলোচ্য বিষয়। শল্যচিকিৎসা বা সার্জারী বিষয়ক লেখায় তিনি মাঝে মধ্যেই উল্লেখ করে গেছেন শীর্ষ স্থানীয় মুসলিম সার্জন বা শল্যেচিকিৎসক আবুল কাশের জাহরভী'র কথা।

আল বাইতারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো ঔষধি গাছের নামকরণ। তিনি এগুলোর নাম দেন আরবীতে। সেই সাথে গ্রীক ও লাতিন ভাষায়ও। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে গ্রীক ও লাতিন ভাষায়ও ছিল তাঁর সুপরিসর দক্ষতা।

আল বাইতার ছিলেন স্পেনের এক উজ্জ্বল তারকা। স্পেনের সোনালী ইতিহাস থেকে মুসলমানদের ইতিহাস পশচাদ্ভাগে চলে যাওযার পর আল-বাইতারের নামও চলে যায় বিস্মৃতির অতল গভীরে। শুধু এই সাম্প্রতিক সময়ে আবার তুলে আনা হচ্ছে আল-বাইতারকে সেই বিস্মৃতির অতল গভীর থেকে। কিন্তু এরপরও তাকে পুরোপুরি তুলে আনা যাচ্ছে না। যাচ্ছে না পূনর্বাসিত করা। বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত এ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মারা যান ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে।

আল-খৈয়াম

বাইনমিয়েল থিওরেমের প্রথম আবিষ্কারক

তাঁর পারিবারিক উপাধিটা যথার্থ অর্থেই মাননসই। 'খৈয়াম' হচ্ছে তাঁর পারিবারিক উপাধি। এর অর্থ তাঁবু তৈরিকারক। আসলেই তিনি ছিলেন তাঁবু তৈরিকারক। তবে তাঁবু বলে যে বস্তুটির সাথে আমাদের পরিচয়, তিনি সে ধরনের তাঁবু তৈরি করেননি বা করতেন না। তিনি ছিলেন জ্ঞান আর প্রজ্ঞার তাঁবুর তৈরিকারক। পণ্ডিত আর শিক্ষাবিদ মানুষেরা আজও তাঁর সেই জ্ঞান আর তাঁবুতে সফর করেন। এই জ্ঞানী আর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের নাম : গিয়াস আল-দ্বীন আবুল ফাতেহ্ ওমর ইবনে-ইব্রাহিম। তবে তাঁর জনপ্রিয় নাম ওমর খৈয়াম। এ নামেই গোটা বিশ্বে তিনি সবচে' বেশি পরিচিতি। জন্ম ১০৪৪ খৃস্টাব্দে। সে সময়ের খোরাশানের রাজধানী নিশাপুরে। খোরাশানের বর্তমান অবস্থান উত্তর-পূর্ব ইরানে।

খৈয়াম বিশ্বব্যাপী এক সুপরিচিত নাম। তাঁর বেশি পরিচিতি রয়েছে একজন বড় মাপের কবি হিসেবে। তাঁর পরেও তাঁর অভাবনীয় সুনাম আছে একজন

গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও সেই সাথে দার্শনিক হিসেবেও। তিনি পারস্যের মানুষ না আরবের মানুষ সে ব্যাপারে আছে নানা সন্দেহ। তবে এমন অভিমত আছে, তিনি আরবেরই লোক। তবে স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলেছিলেন পারস্যে। সোজা কথায় ইরানে। তাঁর শৈশবের জীবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তিনি তাঁর জীবনের বেশির ভাগ জীবন কাটিয়েছেন নিশাপুর আর সমরখন্দে। সমরখন্দ হচ্ছে বর্তমান উজবেকিস্তানের রাজধানী শহর। তখন জ্ঞানার্জনের সুবিখ্যাত কেন্দ্র ছিল বুখারা, বলখ ও ইস্পাহান। খৈয়াম সেসব জায়গায়ও গিয়েছিলেন জ্ঞান অর্জনের তাগিদে। সেখানে তিনি পড়াশোনা করেন। মত বিনিময় করেন বিভিন্ন পণ্ডিতদের সাথে। সমরখন্দের মর্যাদাসম্পন্ন পণ্ডিত আবু তাহের সেখানে তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১১২৩-২৪ খৃষ্টাব্দ সময় পরিধিতে কোন এক দিনে নিশাপুরে তিনি মারা যান।

ওমর খৈয়াম ছিলেন এক মহান আধ্যাত্মবাদী মানুষ। মিষ্টিসিজম বা অতীন্দ্রিয়বাদ বলে একটা কথা আছে। ইন্তেকালের পর সমাধিস্থ অবস্থায় সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন সম্ভব। অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মধ্যে এমন বিশ্বাস কাজ করে। এদেরকে বলা হয় অতীইন্দিয়বাদী বা মিস্টিক। অতীন্দ্রিয়বাদের জগতে ওমর খৈয়ামের যথার্থ অবস্থানের সুপ্রমাণিত সাক্ষ্য বহন করে তাঁর 'রুবাইয়াত এ ওমর খৈয়াম' বা ওমর খৈয়ামের চতুর্থ চরণে অন্ত্যমিল যুক্ত চতুষ্পদী কবিতার স্তবক বিশেষে। এডওয়ার্ড ফিট্জ্জারেল্ড এই রুবাইয়াতের ইংরেজি ভাষান্তর প্রকাশ করেন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে। এই অনুবাদ-কর্ম পশ্চিমা সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনুবাদিত এ রুবাইয়াত একটি জনপ্রিয় ধ্রুপদ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। এটা ছিল জটিল দার্শনিক বাণীর এক মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা। এগুলোর মাধ্যমে তিনি দর্শনের নানা বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেন। যদিও এর কোন অনুবাদই আজ পর্যন্ত মূল রুবাইয়াতের সঠিক সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারেনি। এ সীমাবদ্ধতা থাকার পরও ফিট্জজারেল্ডের অনুবাদকর্ম ছিল খুবই সফল এক অনুবাদ। বাংলাদেশের বইয়ের বাজারে এখন নানা জনের বাংলা করা রুবাইয়াত কিনতে পাওয়া যায়।

তারপরেও ওমর খৈয়ামের সবচে' বড় মাপের অবদান ছিল বীজগণিত বিষয়ে। তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন বিভিন্ন সমীকরণ বিভাজনের কাজে। এর মধ্যে ত্রিঘাত সমীকরণও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বেশকিছু সমীকরণের সমাধানও উপস্থাপন করেছিলেন। কিউবিক ইকুয়েশন বা ত্রিঘাত সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধান ছিলো তাঁর এক উল্লেখযোগ্য অবদান। ওমর খৈয়ামের লেখা বই 'মাকালাত ফি-আল-জাবের ওয়া-আল-মোকাবিলা' বীজগণিত বিষয়ে একটি 'মাস্টারপীস' বা 'সেরা বই' হিসেবে বিবেচিত। এই বইটি বীজগণিতের উন্নয়নে একটি প্রতিনিধিত্বশীল বই হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তিনি ১৩ ধরনের কিউবিক ইকুয়েশন বা ত্রিঘাত সমীকরণ চিহ্নিত করেন। সমীকরণগুলো তিনি

বিভাজন করেছেন সমীকরণের জটিলতার ওপর ভিত্তি করে। তিনি দেখিয়েছেন, উচ্চতর ঘাতের সমীকরণে থাকবে বেশি পদ কিংবা বেশি বেশি পদের সম্মিলন। তিনি তৈরি করেছিলেন দ্বিপদী রাশি বা বাইনমিয়েল এক্সপ্রেশন, যেখানে এর শক্তিসংখ্যা ছিল ধনাত্মক ও পূর্ণসংখ্যা। তাঁকে বিবেচনা করা হয় বাইনমিয়েল থিওরেম বা দ্বিপদী তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কারক। তিনি বের করেছিলেন দ্বিপদী সহগও। তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির সব বিষয় পর্যালোচনা করেছিলেন। তিনি অবদান রেখেছিলেন সমান্তরাল রেখা তত্ত্বের ক্ষেত্রেও।

জ্যোতির্বিদ হিসেবে ওমর খৈয়াম একটি ক্যালেন্ডার উদ্ভাবন করেন। এটি অসাধারণভাবে সঠিক ছিল। নিশ্চিতভাবেই এটি ছিলো গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারের চেয়ে শ্রেয়তর। সেলজুক সুলতান মালিক শাহ্ জালাল-আল-দ্বীন র‍্যা (Ray) নামের এক জায়গায় গড়ে তোলা নতুন এক মান মন্দিরে ডেকে নেন। তখন সময় ছিলো ১০৭৪ খৃষ্টাব্দ। সুলতান তাঁকে দায়িত্ব দেন একটি সঠিক সৌর ক্যালেন্ডার উদ্ভাবনের। রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ ধরনের একটি ক্যালেন্ডার উদ্ভাবনের প্রয়োজন ছিল। বছরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সঠিক সময়ে সম্পাদন নিশ্চিত করার জন্যে এর প্রয়োজন ছিল। ওমর খৈয়াম সাফল্যের সাথে তেমনি একটি ক্যালেন্ডার উদ্ভাবন করেন। তিনি তা উৎসর্গ করেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতান জালাল আল-দ্বীনকে। এই ক্যালেন্ডারের নাম দেয়া হয় 'আল-তারিখ আল-জালালী'। এতে ৩৩৭০ বছরে একদিনের মতো সময়ের গণ্ডগোল ছিল। অপরদিকে গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার একদিনের গোলমাল ছিল ৩৩৩০ বছরে।

খৈয়াম আপেক্ষিক গুরুত্ব বা স্পেসিফিক গ্রাভিটি পরিমাপের সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যা বিষয়ে তিনি লিখেছেন তিনটি বই অধিবিদ্যা হচ্ছে সৃষ্টি ও জ্ঞান বিষয়ক দর্শন শাস্ত্র। এই তিনটি বইয়ের একটির নাম : 'রিসালা দার উয়ুদ'। দ্বিতীয় বইয়ের নাম 'নওরোজ নামা'। তৃতীয় বইটির নাম এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায়। তিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসকও ছিলেন তিনি লিখে গেছেন বিপুল সংখ্যক বই ও মনোগ্রাফ। মনোগ্রাফ হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি বিষয় বা তার কোন এক বিভাগ সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধ। এগুলোর মধ্যে চারটি গণিত বিষয়ক, তিনটি পদার্থবিদ্যা বিষয়ে তিনটি অধিবিদ্যা বিষয়ে, একটি বীজগণিত বিষয়ে এবং একটি জ্যামিতি বিষয়ে।

গণিত বিষয়ের উন্নয়নে ওমর খৈয়ামের স্বীকৃত অবদান খুবই পরিব্যাপক গণিত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান অন্যদের তুলনায় ছিল এক শতাব্দী অগ্রবর্তী। বিশেষ করে এনালাইটিক্যাল জিওমেট্রি বা বিশ্লেষণ গণিতে তাঁর অবদান অসাধারণ ওমর খৈয়ামের গাণিতিক অবদান পরবর্তীতে কিউবিক ইকুয়েশনে সমাধানে ব্যবহার করেছেন ডেসকার্টে। কবিখ্যাতি তাঁর গণিতবিদ হিসেবে খ্যাতিকে পেছনে ঠেলে দেয়। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক বিজ্ঞানী। মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্প্রসারণে তাঁর অবদান সীমাহীন।

আল-মাওয়ার্দি

বিশুদ্ধতম গণতন্ত্রের প্রবক্তা

মধ্যযুগীয় সময়ে সভ্যতা উপহার দিয়েছেন বেশ কিছু মহাপুরুষ। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে তখন আবির্ভাব ঘটেছিল এক উজ্জ্বল নাম : আবু আল-হাসান আলী ইবনে-মোহাম্মদ ইবনে হাবিব আল-মাওয়ার্দি। তিনি এমন একজন রাজনৈতিক দার্শনিক, যিনি খিলাফত ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দাবি তুলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সর্বোচ্চ মাত্রার বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক উপায়ে বিশুদ্ধতম চরিত্রের মানুষ আসীন হোন খলীফা পদে। তিনি ভোটারদের যোগ্যতার মাপকাঠিও ঘোষণা করেছিলেন। তখনকার সময়ে এ কাজটি খুব সহজ ছিল না। কারণ, তখন সময় ছিলো সার্বভৌম উৎপীড়ক শাসকের। তার পরেও আল-মাওয়ার্দি ছিলেন অকুতোভয় নির্ভীকজন। অবজ্ঞাভরে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে নেমে পড়তেন। একজন বিচারক হিসেবে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নাম।

আবু আল-হাসানের জন্ম বসরায়। বসরা হচ্ছে দক্ষিণ ইরাকের এক বন্দর নগর। বসরার গোলাপ পৃথিবী বিখ্যাত। বসরাকে বলা হয় 'ল্যান্ড অব রোজেস' বা 'গোলাপ ফুলের ভূমি'। তাঁর জন্ম ৯৭২ খৃষ্টাব্দে। শৈশবে লেখাপড়া করেন বসরাতেই। তখন বসরায় আবু আল-ওয়াহিদ আল-সিমা নামে বিখ্যাত এক পণ্ডিতবর ছিলেন। সর্বজন গ্রাহ্য এই পণ্ডিতবর ফিকাহ্ বা ইসলামী আইনবিদ্যায় অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হাসান ছিলেন তাঁরই ছাত্র। এরপর তিনি চলে যান বাগদাদে। সেখানে তখন ছিলেন দুই অসাধারণ জ্ঞানী আর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। এদের যশ আর খ্যাতি ছিল অনুপম। তাদের নাম : শেখ আব্দুল হামিদ এবং আব্দুল্লাহ্ আল-বাকি। হাসান তাদের কাছে নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। তাদের কাছে শেখেন আইনবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, রাজনৈতিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য। হাসানের শিক্ষা জীবন ছিল সত্যিই পুষ্পময়। লেখাপড়া শেষে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন একজন প্রশংসনীয় জনে।

তিনি কর্মজীবন শুরু করেন বাগদাদে। একজন কাজী বা বিচারক হিসেবে। এক সময় তিনি উন্নীত হন প্রধান কাজী পদে। তখন তাঁর অবস্থান দাঁড়ায় একজন অসমান্তরাল বিচারক হিসেবে। যুক্তিবিজ্ঞানী হিসেবেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্ধী। আব্বাবাসীয় খলিফা আল-কায়েম-বেন আমর-আল্লাহ তাঁর গুণে ও সক্ষমতায় অবিভূত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁকে ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত বা রোভিং অ্যাম্বেসেডর নিযুক্ত করেন। সে সময়টা ছিল আব্বাসীয় খলিফাদের পতনের সময়। সেটা ছিল বুত্তয়াহিদ ও সেলজুকদের উত্থান সময়। অতএব, তখন রাজনৈতিক সত্তার এক জটিল ত্রিভুজ অস্তিত্ব ছিল। রোভিং অ্যাম্বেসেডর হিসেবে প্রাথমিকভাবে আবু আল-হাসান সফলতা পান। তিনি বিপরীত পরিস্থিতির বিরোধ সংযত করতে পারতেন সহজে। ফিরিয়ে আনতে পারতেন এক ভারসাম্যমূলক পরিস্থিতি। কিন্তু সময় তখন চলে গেছে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে। হাসান চারদিক থেকে পেলেন অসংখ্য রাজকীয় উপহার। পেলেন সব জায়গায় অভূতপূর্ব প্রশংসা। যেসব সুলতানের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করতে পেরেছিলেন, সবাই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত হন। কিন্তু ইতিহাসের নিষ্ঠুরতা তার খ্যাতিকে টিকে থাকতে দেয়নি। সেখানে তাঁর থাকা অবস্থায়ই বুত্তয়াহিদ বাগদাদ দখল করেন।

রাজনৈতিক স্রোত স্বপক্ষে না থাকলেও তিনি বিবেচিত ছিলেন একজন সুখ্যাত রাজনৈতিক-দার্শনিক হিসেবে। ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী এক সমাজ বিজ্ঞানী। তাঁর বই 'আল-হাবি' ছিল একটি অসাধারণ সৃষ্টি। বইটির বিষয়বস্তু আইনবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে : কিতাব আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া, কানুন ওয়াজিরা এবং কিতাব নসিহত আল-মুলক। এই বইগুলোতে

এই মহান পণ্ডিতবর খলিফা, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের দায়িত্ব ও আচরণ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আন্তঃমন্ত্রনালয় সম্পর্ক এবং সেনাবাহিনীর কাজ ইত্যাদির আলোচনাও এসেছে বিস্তারিতভাবে। 'আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া' এবং 'কানুন আল-ওয়াজিরা'র অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। এশিয়া ও ইউরোপ এখনও এসব অনুবাদ-গ্রন্থ থেকে শেখার আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। এসব বই পাঠে লেখকের আকার ও পরিধি সম্পর্কে একটা তৈরি ধারণা সহজেই পেতে পারেন। রাজনীতি বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য আলোচক হিসেবে তিনি আজ কালোত্তীর্ণ এক জন। তিনি মারা যান ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে।
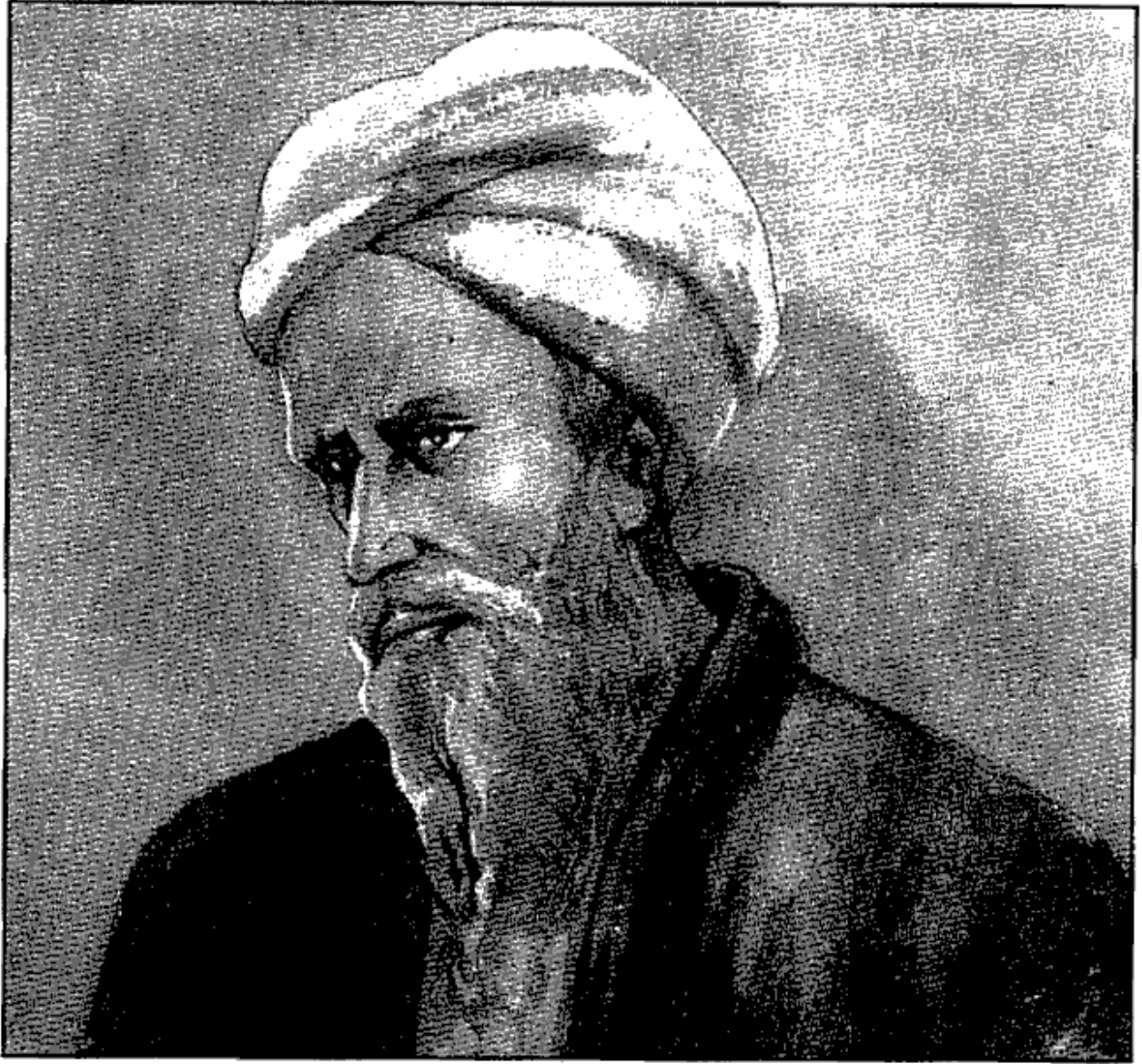
আল-হিশাম
বিশ্লেষণ জ্যামিতি ও চক্ষু বিজ্ঞানের জনক

মানুষের দেখার ক্ষমতা আছে। সেটা আমাদের সবারই জানা। কিন্তু কী কৌশলে মানুষ দেখে সে বিষয়টা আজ আমাদের কাছে জানা হলেও এক সময় মানুষ তা জানতো না। মানুষের দৃষ্টিশক্তির পেছনে যে বিজ্ঞান কাজ করে, যে কৌশল কাজ করে, সেটা আমাদের কাছে প্রথম তুলে ধরেন একজন মুসলিম বিজ্ঞানী। পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম তাকে জেনেছে 'ফাদার অব অপথালমোজি' বা 'চক্ষুবিজ্ঞানের জনক' অভিধায়। এই অসাধারণ সাধক বিজ্ঞানীর নাম আবু আলী হাসান ইবনে আল-হিশাম। তাঁর জন্ম বসরায়। গোলাপ ফুলের ভূমি বলে যার বিশ্বজুড়ে খ্যাতি। বসরা ইরাকের একটি নগরী। আল-হিশামের জন্ম ৯৬৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি গণিত জগতে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যান। জ্ঞানের ভাণ্ডার সম্প্রসারিত করেন চক্ষু বিজ্ঞান ও ভেষজ বা ওষুধ বিদ্যায়ও। আল-হিশাম একজন বড় মাপের পদার্থবিদও ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা নেন বসরায়। এরপর শিক্ষা লাভের জন্যে যান বাগদাদে। তারও পরে মিশরে। সবশেষে পড়তে যান স্পেনে। আলোর প্রতিসরণ বা 'রিফ্রেকশন অব লাইট'-এর সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরে তিনি নিজেকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি আলোর প্রতিফলনের মাধ্যমে রঙের বৈচিত্র্য আনার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।

আল-হিশামই সবার আগে মানুষের চোখের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। চোখ সম্পর্কে তিনি যেসব তথ্য ও ধারণা উপস্থাপন করেন এর আগে মানুষ সে সম্পর্কে জানতো না। তাঁর তথ্য ও ধারণাসমূহ আজও সত্য বলে প্রমাণিত। এগুলো ছিল সুস্পষ্ট। তিনি মানুষের দৃষ্টিশক্তির কলাকৌশল ব্যাখ্যা করেন। মানুষের দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে টলেমি ও ইউক্লিডের দেয়া তথ্য ভুল প্রমাণ করেন আল-হিশাম। এঁরা বিশ্বাস করতেন মানুষের চোখ থেকে আলো বস্তুতে প্রতিফলিত হয়। তখন বস্তু দৃশ্যমান হয়। আল-হিশাম প্রমাণ করেন, আলো বস্তু থেকে চোখে প্রতিফলিত হয়। তখন সেটি চোখে ধরা পড়ে। আর তাই গৃহীত হয় সত্য ও বাস্তব বলে। এ ক্ষেত্রে একক কৃতিত্ব স্বীকার করা হয় আল-হিশামের। তখন টলেমী ও ইউক্লিডের মতো সর্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে বিপরীত কিছু বলার কাজটি ছিল রীতিমতো দুঃসাহসের কাজ। আল হিশাম অসাধারণ প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ হওয়ার কারণেই সে দুঃসাহস দেখাতে পেরেছিলেন।

চক্ষু বিজ্ঞানের জগতে আল হিশামের আবিষ্কার উদ্ভাবন অসংখ্য। তাঁকে যথাকারণেই বলা হয় চক্ষুবিজ্ঞানের জনক। তিনি সেখানেই থেমে যাননি। এই উর্বর-মগজসমৃদ্ধ বিজ্ঞানী ছায়া, গ্রহণ, রঙধনু এবং আলোর মৌল প্রকৃতি নিয়েও কাজ করেন। গোধুলি ও সূর্যাস্তের সময়কার সূর্যরশ্মি বিকিরণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানার জন্যে তিনি শ্রমসাধ্য গবেষণা করেন। তিনি দু-চোখের দৃষ্টি সম্পর্কিত ধারণার ব্যাখ্যা দেন। তাঁর বিখ্যাত বই 'কিতাব আল-মানাজির' লাতিন ভাষায় অনুবাদ হয়। এই বইটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে একটা নতুন ধারার সূচনা করে। পরবর্তী সময়ে রোজার বেকন ও ক্ল্যাপারের লেখা বইগুলোতে এ বইটির বেশ প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন আকার ও গঠনের কাঁচ নিয়ে তিনি আলোর প্রতিফলনের ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। তিনিই প্রথম আমাদের জানান, আলোর প্রতিফলন কোণ ও প্রতিসরণ কোণ একই থাকে না। তিনি দেখাতে সক্ষম হন, বিভিন্ন পুরুত্বের কাঁচ বিভিন্ন আকারের বস্তুর উপর একই প্রতিফলন ঘটায়। কাঁচের বিভিন্নতা একই বস্তুর আকার পরিবর্তন করতে পারে। এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্যে রূপ লাভ করে।

আল-হিশাম সুস্পষ্ট বুঝে নেন অল্টিচুড ও এটমস্পেরিক ডেনসিটির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি এ বিষয়ে একটি বিস্ময়কর বই লিখে গেছেন। বইটির নাম : মিজান আল-হিকামা। এটমস্পেরিক রিফ্রেকশন বিষয়ে

তিনি গবেষণা করে গেছেন। দিগন্তে চন্দ্র ও সূর্যের আপাত বৃহত্তর আকারের ব্যাখ্যা দেন। তিনি সর্বপ্রথম গোধূলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন দিগন্ত রেখার ১৯ ডিগ্রির মধ্যে সূর্য থাকাবস্থায় গোধুলির সৃষ্টি হয়। এই ১৯ ডিগ্রির চেয়ে নিচে সূর্য চলে গেলে গোধূলী কেটে যায়। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তিনি চেষ্টা করেছেন বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা পরিমাপের। পদার্থের অভিকর্ষণ ও আকর্ষণের কারণে গতির ভিন্নতা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরী অবগত ছিলেন। এ সম্পর্কে তার রেখে যাওয়া বর্ণনা খুবই সুবিস্তৃত।

গণিত বিষয়ে আল-হিশামের অবদান তুলনাহীন। তিনি জ্যামিতি ও বীজগণিতের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। সে সূত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন বিশ্লেষণ জ্যামিতি বা এনালাইটিক্যাল জিওমেট্রি। তিনি গবেষণা করে গেছেন পদার্থের গতি বিষয়ে। এক্ষেত্রে তিনি ইতিবাচক ফলাফল খুঁজে পান। তিনি সংজ্ঞা দেন : কোন বাহ্যিক ফোর্স বা শক্তি না থামালে কিংবা এর গতি পরিবর্তন না করলে গতিশীল বস্তু অনন্ত সময় গতির মধ্যে থাকবে। এটাই গতির প্রথম সূত্র হিসেবে পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠা পায়।

অনুমান করা হয়, আল-হিশামের লেখা বইয়ের সংখ্যা দুইশ'র মতো। সময়ের প্রতিকূলতা পেরিয়ে তাঁর খুব কম সংখ্যক বই-ই তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছে। চক্ষু বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর মূল বই এখন আর পাওয়া যায় না। লাতিন ভাষায় এর অনুবাদিত সংস্করণ এখনও পাওয়া যায়। মহাজগত সম্পর্কিত তাঁর লেখা বইটিও লাতিন, হিব্রু ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। পৃথিবীর উদ্ভব সম্পর্কিত তাঁর রচনাগুলো এখনও সাগ্রহের বিষয়। পাশ্চাত্য সব সময় প্রাচ্যের প্রজ্ঞা সম্পর্কে ছিল সন্দেহ প্রবণ। আল-হিশামের মতো একজন বিজ্ঞানীর জন্ম পাশ্চাত্যে হলে, তিনি হতেন বিশ্বব্যাপী স্মরণীয় বরণীয় এক মানুষ। যেহেতু তিনি ছিলেন প্রাচ্যের মানুষ, সে জন্যে পাশ্চাত্য সব সময় তাকে এড়িয়ে চলেছে।

আল-হিশামের কাজ শুধুমাত্র আবিষ্কার আর তত্ত্ব উপস্থাপনের মধ্যেই সীমিত ছিল না। তাঁর অনুশীলন বিজ্ঞানের একটি পদ্ধতি বা ব্যবস্থার জন্ম দেয়। তাঁর কর্মসূত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি রূপ লাভ করে সার্বজনীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত হয় নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এসব তত্ত্ব বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক অঙ্গন সৃষ্টি করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা সূত্রে সিদ্ধান্ত, অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছে তা প্রমাণের মাধ্যমে তিনি রচনা করে গেছেন বিজ্ঞানের ভিত্তি। এর ফলে বিশ্ব বিজ্ঞান জগতে আসে এক মৌল পরিবর্তন। কিন্তু যথাযোগ্য উত্তরসূরীর অভাবে মুসলিম পণ্ডিতদের অনেক অবদান আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে বা যাচ্ছে।

আল-হিশামের মতো একটি ফুল বসরায় জন্মেও সে ফুলের সময়টা ছিল প্রতিকূল। ফুলের যত্ন নেয়া হয়নি যথাযথভাবে। ফুল গাছে ঢালা হয়নি প্রয়োজনীয় পানি। এটা আমাদের সম্মিলিত লজ্জা।

ইবনে সিনা

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক

দশম শতাব্দীর মানব সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে বিজ্ঞান জগতের এক প্রতিভাধর মানুষকে। তাঁকে গণ্য করা হয় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিসেবে। শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানেই নয়, নানা বিষয়ে তিনি হয়ে ওঠেন এক অনন্য প্রতিভাধর। তিনি দার্শনিক, বিশ্বকোষ রচয়িতা, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও অসমান্তরাল ভূ-বিজ্ঞানী। এই উজ্জ্বল মানুষটির নাম আবু আলী আল-হোসেইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা। তাঁর জন্ম ৯৮০ খৃষ্টাব্দে। বুখারার কাছাকাছি আফসানা নামের একটি জায়গায় তাঁর জন্ম। বুখারা হচ্ছে বর্তমান উজবেকিস্তানের রাজধানী। আমু নদীর পূর্ব তীরের নগরী। আবু-সিনা নামেও ইবনে সিনা পরিচিত। তবে তাঁর জনপ্রিয় পরিচয় ছিল বু-আলী নামে।

প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন বুখারায়। দশ বছর বয়সেই পড়ে ফেলেন বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের বই। সে সময়ের এক বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন আবু আব্দুল্লাহ নাতিলি। তিনি ছিলেন ইবনে সিনার শিক্ষক। তরুণ বয়সেই ইবনে সিনার চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান আন্তর্জাতিক মাত্রা পায়। মাত্র ১৭ বছর বয়সে হয়ে ওঠেন এক অবাক করা চিকিৎসক। তখন বুখারার সম্রাট ছিলেন নূহ্ ইবনে মনসুর। এক সময় তাঁর বড় ধরনের এক রোগ হয়। সব বড় বড় ও সুবিখ্যাত চিকিৎসকেরা তাঁর আরোগ্য লাভের আশা ছেড়ে দেন। তরুণ বু-আলী এগিয়ে এলেন তাঁর চিকিৎসায়। তাকে রোগ থেকে সারিয়ে তুলেন। সবাই একেবারে হতবাক। সম্রাট নূহ্ ইবনে মনসুর তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। তিনি কোন বস্তুগত পুরস্কার নিতে রাজি হলেন না। চাইলেন শুধু রাজকীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ।

বাবা মারা যাবার পর বু-আলী বুখারা ছেড়ে চলে যান। চলে যান গু[illegible]জান-এ। সেখানে কাওয়ারিজম শাহ তাঁকে স্বাগত জানান। সেখানে সাক্ষাৎ পান আল-বেরুনীর। এরপর তিনি চলে যান 'রে' নামের এক জায়গায়। তারও পরে যান হামাজান-এ। সেখানেই তিনি লিখেন তার বিখ্যাত বই 'আল কানুন ফি-অলি-তিব'। এরপর চলে যান ইস্পাহান-এ। ইবনে সিনার প্রবাদসব বই 'আল-কানুন' পাশ্চাত্যে পরিচিত ছিল 'কানুন' নামে। এটি ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অবাক বিস্ময়। এটি এক মহা বিশ্বকোষ, যার বিষয় চিকিৎসা বিজ্ঞান। এ বিশ্বকোষে আছে ১০ লাখেরও বেশি শব্দ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাবতীয় জ্ঞানের বিষয় এতে আলোচিত হয়। বিশেষ করে এসব জ্ঞানের সমাহার ঘটানো হয় প্রাচীন মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের রেখে যাওয়া উৎস থেকে।

আল-কানুন বইটি রাজী'র 'হাওই' এবং আলী ইবনে আব্বা 'মালিকী' বইটিকেও উৎসকর্ষতায় ছাড়িয়ে যায়। এমনকি গ্যালনের কর্মসফলতাও অন্ধকারে তলিয়ে যায় আল-কানুনের সাফল্যে। পুরো ছয় শতাব্দীব্যাপী আল-কানুন বিরাজ করেন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ হিসেবে। এই বিশ্বকোষ বিশ্ববাসীকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অতীত জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অনন্য এক সুযোগ করে দেয়। এই বইয়ে প্রতিফলিত হয়েছে ইবনে সিনার নানা মৌল অবদান। তিনি আবিষ্কার করেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের তিন স্তম্ভ। তিনি থাইসিস বা যক্ষ্মারোগের সংক্রামক প্রকৃতি নিরূপণ করেন। তিনি মাটি ও পানিবাহিত রোগ চিহ্নিত করেন। শারীরবিদ্যা ও স্বাস্থ্যের মধ্যে যে আন্তঃক্রিয়া তাও চিহ্নিত করেন ইবনে সিনা। এই বইটিতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে ওষুধ বিজ্ঞানের নানা পদ্ধতি নিয়ে। এতে বর্ণনা আছে ৭৬০টি ওষুধের। অতএব এটি ছিল সে সময়ের 'মেটিরিয়া মেডিকা'। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন মেনেনজাইটিস এবং এর ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করেন। শারীরবিদ্যা, স্ত্রীরোগবিদ্যা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়েও রয়েছে ইবনে সিনার উল্লেখযোগ্য অবদান।

'কিতাব আল-শিফা' ইবনে সিনার আরেকটি অসাধারণ বই। এটি বিজ্ঞান ও দর্শন জ্ঞানের এক মহা সম্মিলন। এটি দর্শন বিষয়েও এক কোষগ্রন্থ। এই দার্শনিক ব্যক্তিত্ব তাঁর জ্ঞানের ক্ষেত্র তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এ দু'ভাগে ভাগ করে যান। পদার্থবিদ্যা, গণিত ও অধিবিদ্যা হচ্ছে তাত্ত্বিক জ্ঞান জগতের অন্তর্ভুক্ত। ন্যায় শাস্ত্র, অর্থনীতি ও রাজনীতি হচ্ছে ব্যবহারিক জ্ঞানের আওতাভুক্ত। ইবনে সিনার দর্শন ছিল দর্শনের তিনটি মূলধারার বিশ্লেষণ। এই ধারা তিনটি হচ্ছে : এরিস্টটলীয় ঐতিহ্যধারা, নব্য-প্লেটোনিক প্রভাবধারা এবং ইবনে সিনার দর্শনের সাথে মিলে মিশে একাকার মুসলিম দর্শন ধারা।

গণিত, পদার্থবিদ্যা ও সঙ্গীতে তার অবদান উজ্জ্বল ও দীপ্তিশীল। 'Casting out of nines'-এর ব্যাখ্যা দেন তিনি। বর্গ ও ঘনকে এর প্রয়োগ-পরীক্ষাও করেন তিনি। পদার্থ বিদ্যায় শক্তি, তাপ, আলো, বল, শূণ্যগর্ভ, অসীম ইত্যাদি ক্ষেত্রে রয়েছে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, সময় ও গতির মধ্যেকার আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি। তিনি গবেষণা করে গেছেন : আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে। তিনি ব্যবহার করেছিলেন একটি 'এয়ার থার্মোমিটার' বা 'বায়ু থার্মোমিটার'।

সঙ্গীত জগতে তাঁর অবদান সে সময়কার সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি ফারাবি'র কিছু কাজের উন্নতি সাধন করেছিলেন। হারমনিক সিস্টেমে চতুর্থ এবং পঞ্চমটির দ্বিগুণ করা ছিল অগ্রগতির এক ধাপ। ইবনে সিনা লক্ষ করেন যখন n = ৪৫ তখন কানে আসা শব্দে সুর সমন্বয় থাকে না। সুর সমন্বয়ের সিরিজ উপস্থাপিত হয় (n+1)/n সূত্রের মাধ্যমে।

ইবনে সিনা কেমিক্যাল ট্রান্সমুটেশন বা রাসায়নিকভাবে পদার্থের পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ধাতু আলাদা হয় মৌল বিচারে। এটা ছিল সে সময়কার ধ্যান-ধারণার বিপরীতে। তার 'ট্রিটিজ অব মিনারেলস' আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান। ভূবিজ্ঞানে এটাই ছিল শতাব্দীর 'একমাত্র জ্ঞানের উৎস'। দর্শন বিষয়ে ইবনে সিনার ছিল আরও দুটি বই : 'আল-নাজাত' এবং 'ইশারাত'।

ইবনে সিনা সারা জীবন কাটিয়েছেন ভ্রমণে। তখনকার দিনে রাজনৈতিক বিপর্যয় ছিল নিয়মিত ব্যাপার। তাঁর মানসিক ক্ষমতা ছিল অতিমাত্রিক। শেষ জীবনে তিনি ফিরে আসেন হামাদান-এ। আজও এই উজ্জ্বল চিকিৎসা বিজ্ঞানীর কথা স্মরণ করা হয় শ্রদ্ধাভরে। ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। হামাদান-এর মাটিতে তাকে সমাহিত করা হয়।
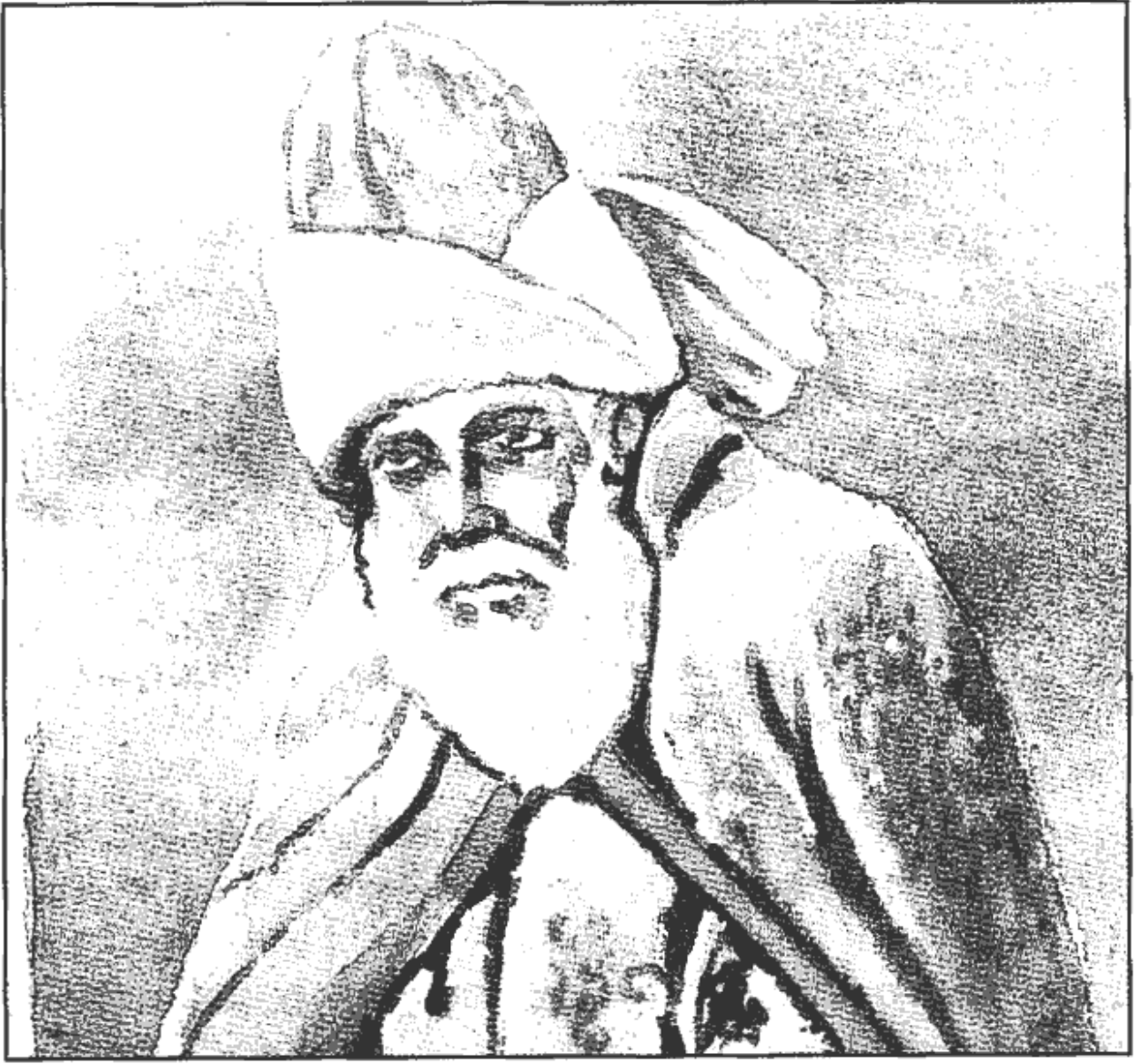
আল-রুমি
তাসাউফের বিস্তারিত উপস্থাপন

মানুষের আরেক নাম : 'আশরাফুল মখলুকাত'। আর এর অর্থ মানুষ 'সৃষ্টির সেরা'। মানুষের প্রতি আল্লাহর এ এক পরম উপহার। সেই সূত্রে মানুষ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যেকার সত্যিকার সম্পর্ক উদ্ঘাটনে। মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কী? এটি একটি অবাক করা প্রশ্ন। মানুষ অবশ্য এ প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে। অনন্য জ্ঞানী ও গুণীজনেরা আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন। তেমনি একজন মানুষ 'জালাল আল-দ্বীন মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হোসাইন আল-রুমি রাদিয়াল্লাহু আন্হু'। তাঁর জন্ম ৬০৪ হিজরী সনে। ১২০৭ কিংবা ১২০৮ খৃষ্টাব্দে। আফগানিস্তানের বলখ-এ। তিনি একজন মহাপণ্ডিত থেকে হয়েছিলেন একজন দরবেশ। তিনি আমাদের কাছে বিস্তারিত উপস্থাপন করে গেছে 'তাসাউফ'। তাসাউফ হচ্ছে সুফীবাদের ইসলামী ধারণা বা মতবাদ।

আল-রুমির বাবাও ছিলেন একজন সুপরিচিত ধর্মীয় পণ্ডিত। তাঁর নাম বাহা আল-দ্বীন। রুমি পুরোপুরি বাবার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। রুমির শৈশবের লেখাপড়া চলে

বাবা বাহা আল-দ্বীনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে। আর তাঁর শিক্ষক ছিলেন সৈয়দ বোরহান আল-দ্বীন। রুমির পরিবার বারবার প্রত্যাবাসন করেছেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। তার বয়স যখন ৮, তখন স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন কেনিয়ায়। পঁচিশ বছর বয়সে তাঁকে পাঠানো হয় উত্তর সিরিয়ার আলেপ্পো। উদ্দেশ্য : উচ্চ শিক্ষা লাভ। আরও জ্ঞানার্জনের জন্যে এর পর চলে যান দামেস্কে। চল্লিশ বছর পুরো না হওয়া পর্যন্ত তিনি ব্যস্ত থাকেন জ্ঞান অর্জনের কাজে। তাঁর শিক্ষা লাভের প্রথম পর্যায় ছিল প্রাতিষ্ঠানিক। তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানার্জনে বলা যায় এভারেস্ট বিজয় করেন। এরপর প্রবেশ করেন অলৌকিক আধ্যাত্মবাদের জগতে। এটি 'ইলমে মারেফাত'। মারেফাত জ্ঞানের উপলব্ধির অযোগ্য এক জগত। একে 'ইলমে লাদুনি'-ও বলা হয়। যাকে বর্ণনা করা হয় 'উইজডম অব উইজডম' বা 'প্রজ্ঞার প্রজ্ঞা' বলে।

অলৌকিক জ্ঞান রাজ্যে রুমির প্রবেশ একটি অনন্য ঘটনা। অলৌকিক প্রজ্ঞা ও অসাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান-এ দুয়ে মিলে তিনি অর্জন করেন এক সুউচ্চ অবস্থান। আধ্যাত্মিক জ্ঞান জগতে তাঁকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার ব্যাপারে তার দু'জন শিক্ষক ছিলেন। এরা হচ্ছেন, সৈয়দ বুরহান আল-দ্বীন রাদিআল্লাহু আনহু এবং শেখ শামস আল-দ্বীন তাবরিজ রাদিআল্লাহু আনহু। দ্বিতীয় শিক্ষক ব্যক্তিত্বের হাতে রুমি নতুন সাজে সেজে ওঠেন। সে অনুযায়ী তিনি হন উপস্থাপিত। সেখানে তিনি অর্জন করেন গভীরতম ধর্মীয় জ্ঞান। পেশাগতভাবে রুমি ছিলেন একজন শিক্ষক। কোনিয়া'র একটি মাদ্রাসায় তিনি বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে পড়ান।

রুমি দর্শনের ওপর অভূতপূর্ব প্রভাব সৃষ্টি করেন। সেইভাবে প্রভাব সৃষ্টি করেন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মবাদের ওপরেও। তাঁর প্রবাদসম বই 'মসনবী শরিফ' আজকের দিনের জ্ঞানী-গুণীদের জন্যেও আলোক-বর্তিকা স্বরূপ। এই বইটিকে মনে করা হয় পেহলভী ভাষায় কোরানের এক জলন্ত ব্যাখ্যা। ইরানের প্রাচীন ভাষার নাম পেহলভী। 'মসনবী শরীফ' অধিবিদ্যা, ধর্ম, ন্যায়শাস্ত্র, আধাত্মবাদ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সবচে' বড় মাপের বই। রুমি সুফীবাদের অনেক বিষয় এর মাধ্যমে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। প্রতিদিনের মানুষের জীবন আর অলৌকিক জগতের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে দিতে চেয়েছিলেন রুমি। এ ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর সফলতা পান। তিনি বাস্তবে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। মানুষে মানুষে তিনি আন্ত ও আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে গেছেন। তিনি মানুষের চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক অভিযাত্রায় মানুষের উত্থান ও আবিষ্কারের বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করে গেছেন। তিনি মানুষকে শিখিয়েছিলেন নিজে সত্তা বিলিয়ে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে। এটি হচ্ছে 'হাল'—একটি পরিস্থিতি, যেখানে সমগ্রের মাঝে একক সত্তা বিলিয়ে দেয়া হয়।

রুমির আরও দু'টি প্রশংসনীয় প্রকাশনা রয়েছে : 'দিভান' এবং 'ফিহিমা-ফিহি'। এটি আধ্যাত্মিক বাণীর এক সঙ্কলন গ্রন্থ। মসনভী শরীফ বিবেচিত হয় একটি বিশেষ ধরনের বই হিসেবে। এই বই লেখার পর পর বিভিন্ন পণ্ডিত জনেরা দ্রুত এগিয়ে আসেন এ ব্যাপারে সমালোচনা লেখার জন্যে। বিভিন্ন ভাষায় এর আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশ পায়। মসনবী-তে রুমি যে বাণী ছড়িয়ে দেন, এশিয়া ও ইউরোপের অনেক পণ্ডিত জনেরাই মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন, এর মাধ্যমে রুমি পান এক অভাবনীয় খ্যাতি।

জালাল আল-দ্বীন মারা যান ৬২৭ হিজরী সনে। ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে। মারা যান কোনিয়ায়। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।
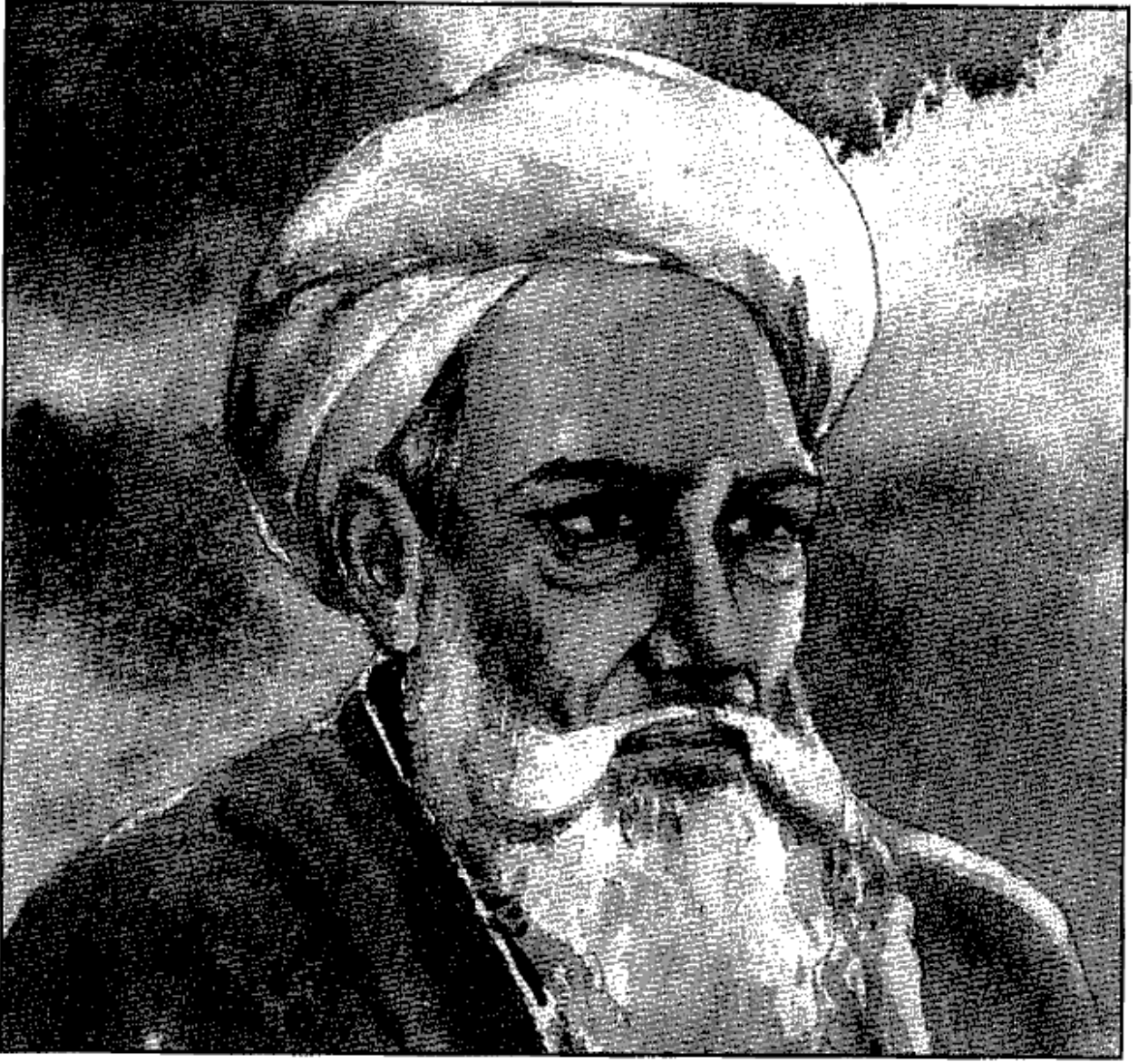
আল-ফারাবি
অ্যারিস্টটলের পর দর্শনের 'সেকেন্ড মাস্টার'

আল-ফারাবি। পুরো নাম আবু নাসের মোহাম্মদ ইবনে আল-ফারাখ আল ফারাবি। সুফী-সাধক। সুফী-দার্শনিক। প্রজ্ঞাবান এই মহান পুরুষ ঐশ্বরিক কৃপা পেয়েছিলেন পরিপূর্ণভাবে। আল-ফারাবির জন্ম ওয়াসিগ-এ। তুর্কিস্তানের ফারাব-এর কাছাকাছি এক গ্রাম হচ্ছে এই ওয়াসিগ। জন্ম ২৫৯ হিজরী সনে অথবা ৮৭০ খৃস্টাব্দে। বাবা ছিলেন একজন জেনারেল। ইউরোপে ফারাাবির পরিচয় ছিল আল-ফারাবিয়াস নামে।

শৈশবে লেখা পড়া করেন ফারাবে এবং বুখারায়। বর্তমান উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের একটি বড় শহর হচ্ছে বুখারা। এরপর তিনি চলে যান বাগদাদে। ৯০১-৯৪২ খৃস্টাব্দ সময় পরিধিতে তিনি সেখানে লেখাপড়া করেন। গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন। এই দীর্ঘ সময় পরিধিতে তিনি বেশ কিছু ভাষাও শেখেন।

বিজ্ঞান ও ত্রিকোণোমিতি ছিল তাঁর জ্ঞানার্জনের প্রধানতম ক্ষেত্র। খুব শিগগিরই তিনি হয়ে ওঠেন প্রথম সারির বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তিনি একজন বড় মাপের ভাষাবিদও ছিলেন। তাঁর জ্ঞানান্বেষণে কাজটি ব্যাপৃত ছিল ৬ জন আব্বাসীয় খলিফার শাসনামল জুড়ে। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্যে বহু জায়গায় গেছেন। এর মধ্যে মিশরও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তাঁর জীবন উৎসর্গীত ছিল সুফীবাদ ও দর্শনের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষে। এর ফলে তিনি সৃষ্টি করে যেতে পেরেছেন এক নতুন ভাবনার জগত। পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দিয়ে গেছেন নব নব ধারণা। তাই ইবনে সিনার বিজয়ী অগ্রগমনকে করে তুলেছিল সহজতর। শত শত জ্ঞানান্বেষী ও আধ্যাত্মিক পথিক এ পথে চলে নিজেদের করে গেছেন ধন্য। আল-ফারাবি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ।

আল-ফারাবি এক সময় চলে যান হালাব-এ। হালাব-এর আধুনিক নাম আলেপ্পো। আলেপ্পো হচ্ছে উত্তর সিরিয়ার একটি নগরী। এখানকার অধিবাসীদের বলা হয় আলেপ্পাইন। তখন আলেপ্পোর সম্রাট ছিলেন সাইফ আল-দৌলা। সম্রাটের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলোচনা হওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে সম্রাট হয়ে ওঠেন তাঁর পরম ভক্ত। পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। ফারাবি হলেন তাঁর সব সময়ের সাথী। ফারাবির খ্যাতি এরই মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এর আগে তাঁর জীবন ছিল নানা দুঃখ আর দুর্ভোগ তাপে জর্জরিত। তাঁর দুর্ভোগ আন্দাজ অনুমান করার মতো নয়। এক সময় তাকে বাগানের মালী হিসেবেও কাজ করতে হয়। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি কাজী পদে আসীন হন। কিন্তু অল্প সময়েই এ পেশা ছেড়ে শিক্ষকতায় আসেন। ফারাবি'র পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্র ছিল সুপরিসর। তা বিস্তৃত ছিল বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত, সঙ্গীত ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বিস্তৃত। তাঁর অবদান দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যায় ছিল প্রতিনিধিত্বশীল। তাঁকে বিবেচনা করা হয় নিও-প্লেটোনিস্ট বা নব্য প্লেটোবাদী। তবে এ বিবেচনা যথার্থ ছিলো না। তিনি প্লেটোবাদী ধ্যান-ধারণা ও অ্যারিস্টটলবাদী ধ্যান-ধারণার মধ্যে একটা ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। এ প্রয়াস সূত্রে তিনি শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে গেছেন চিন্তার নতুন ধারা। তার লেখা বইগুলোর সবগুলো এখন আর পাওয়া যায় না। যে মানুষটির ধ্যান-ধারণা প্লেটো ও অ্যারিস্টটলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তাঁর অবদান পুনরুদ্ধার করা যায়নি সে কারণেই। ফলে পাশ্চাত্যের চোখে তিনি এক প্রয়োজনাতিরিক্ত।

সমসাময়িক দুনিয়ায় আল-ফারাবিকে ধরা হতো 'সেকেন্ড মাস্টার অব ফিলোসপি'। অ্যারিস্টটল ছিলেন 'ফার্স্ট মাস্টার'। ফারাবির জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্র ছিল অ্যারিস্টটলীয় পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা। তিনি তাঁর নিজস্ব

ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করে লিখে গেছেন বেশ ক'টি বই। তাকে যথার্থ অর্থেই দর্শন জগতের সেকেন্ড মাস্টার বা 'আল-মুয়াল্লিম আল-তানি' বলা হতো। তিনি যুক্তিবিদ্যার শিক্ষণকে দু'ভাগে ভাগ করেন। একটি ভাগ তাকাজ্জাল বা ধারণা বা আইডিয়া। অন্যটি 'জুবাত' বা প্রমাণ। দর্শন শিক্ষণ ও শেখার ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন।

সমাজ বিজ্ঞান, মনস্তত্ব ও অধিবিদ্যায় আল-ফারাবির মৌল গবেষণা খুবই অমূল্য। সৃষ্টি রহস্যের আলোক মানুষের কর্মকাণ্ড তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যথার্থভাবে। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে তার বিখ্যাত বইয়ের নাম 'আল আহলে আল-মদিনা আল-ফাজিলা'। সঙ্গীতে তাঁর অবদান বিস্ময়কর। তিনি বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করেন। সিম্ফনি বা সুরের ঐকতান সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। কিছু প্রজ্ঞা পরিধির পরিচয় মেলে তাঁর লেখা বই 'কিতাব আল-মিউজিকা'য়। তিনি নিজে সঙ্গীত জগতের এক প্রবাদ-প্রতিম ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। যখন তিনি তাঁর বাদ্যযন্ত্রের তারে হাত দিতেন, তখন ইচ্ছে মতো সুর তোলে শ্রোতাদের হাসাতে ও কাঁদাতে পারতেন। তিনি রাজনীতি বিজ্ঞান, দর্শন, পদার্থ বিদ্যার গভীর জ্ঞান রাজ্যে বিচরণ করে এসব বিষয়ে হয়ে ওঠেন পণ্ডিতসম ব্যক্তিত্ব। রাজনীতি বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক তাঁর বই আলা আহলে আল-মদিনা আল-ফাজিলা' এক অনন্য সৃষ্টি। পদার্থে বিজ্ঞান আল-ফারাবি প্রথম প্রমাণ করেন 'এম্পটি স্পেস'-এর অস্তিত্ব।

তাঁর বইয়ের সংখ্যা আজ আন্দাজ অনুমানের বিষয়। কেউ বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ১১৭টি বই লিখে গেছেন। এগুলোর মধ্যে ৪৩টি যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে, ১১টি অধিবিদ্যা বিষয়ে, ৭টি আইনবিদ্যা ও ৭টি রাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ে। এছাড়া সঙ্গীত, ওষুধ ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে আছে তাঁর আরও ১৭টি বই। তাঁর সবচে' সেরা বইটি লেখা দর্শন বিষয়ে। বইটির নাম 'ফুসুস আল-হিকাম'। প্রাথমিক পাঠ্য বই হিসেবে এটি বহুদিন ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘ দিন অব্যাহতভাবে চালু ছিল। প্রাচ্যে উচ্চ শিক্ষায় ব্যবহার হতো ফারাবির লেখা কিছু বই। ফারাবি বিজ্ঞানের সবচে' অন্তর্নিহিত নীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সবচে' উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে 'কিতাব আল-উলুম'। ফারাবির কাছে 'Theology of Aristotle'-এর একটা মূল কপি ছিল। জনপ্রিয় বিশ্বাস ছিল, এটি এরিস্টটলের লেখা মূল কপি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার ভিন্নরূপ প্রমাণিত হয়। ধারণা করা হয়, এটা ছিল অ-প্লেটোনীয় কোন দার্শনিকের লেখা বই। খুব সম্ভবত, এটা ছিল ফারাবির নিজেরই কাজ। কয়েক শতাব্দী ধরে ফারাবির তত্ত্বগুলো দর্শন শাস্ত্রে প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা পালন করে। তাঁর অবদান যথাযথভাবে মূল্যায়ন মুশকিল। রীতিমতো কঠিন। কারণ তার অবদান এতো বিশাল যে পরিমাপ করা সহজ কাজ নয়।